KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication 24, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৩/- ৩/- ৩/- ৩/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ শ্রাবণ, ১৩৬২ ভাদ্র, ১৩৬২ কার্ত্তিক, ১৩৬২
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

রেজিষ্টার্ড নং সি ৩৫৯৭ মূল্য আট আনা সমকালীন

আদর্শ পথ্য
পানীয় ও খাদ্য

লিলি ব্রাণ্ড বার্লি

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত
লিলি বার্লি মিলস্ লিঃ কলিকাতা-৪

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদক
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ● নারায়ণ চৌধুরী

তৃতীয় বর্ষ আষাঢ় ১৩৬২

সমৃদ্ধির জন্য

আরও কোটি কোটি টাকা

নিউ ইণ্ডিয়ার রজত-জয়ন্তী উৎসব ঃ
১৯৫৪ সালে ৪৩ কোটি টাকার ওপর নতুন কাজ্ সংগ্রহ ক'রে এই কোম্পানী জীবনবীমা ব্যবসায়ে তাঁদের ২৫তম বৎসর উদ্‌যাপন ক'রেছে।

নিউ ইণ্ডিয়ার সাফল্য ঃ
১৯৫৪ সালে কোম্পানী দৈনিক প্রায় ১২ লক্ষ টাকার নতুন জীবনবীমার কাজ ক'রেছে। ১৯৫৩ সালে দৈনিক কাজের পরিমাণ ছিল ৫½ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪৭ সালে ছিল ২⅛ লক্ষ টাকা।

নিউ ইণ্ডিয়ার এই প্রচণ্ড অগ্রগতি পৃথিবীর **যে কোন দেশের যে কোন** জীবনবীমা কোম্পানীকে হার মানিয়েছে।

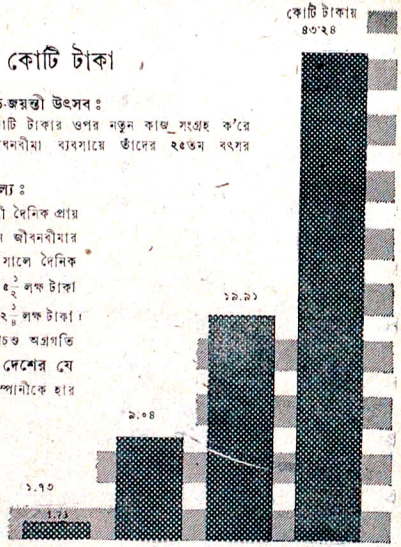

জনসাধারণের সহযোগিতা ও নিউ ইণ্ডিয়ার কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই বিরাট ব্যবসায় গড়ে উঠেছে। এঁদের সকলের কাছেই কোম্পানী গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

বিরাট সম্ভাবনা ঃ
কিন্তু জাতিগঠনের নানা কাজে এখনও আরও কোটি কোটি টাকা নিয়োগ করা যেতে পারে। কারণ ভারতবর্ষে জীবনবীমা প্রসারের এক বিরাট সম্ভাবনা র'য়েছে—**বর্তমানের তুলনায় অন্ততঃ আরও দশ গুণ বেশী।** নিউ ইণ্ডিয়া তার অতুলনীয় সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের প্রসারে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রবার সংকল্প ক'রেছে।

উৎসর্গ ঃ
দেশের প্রতিটি গৃহে জীবনবীমার অভয় বার্তা বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য কোম্পানীর দক্ষ প্রতিনিধিরা আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন। তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহায়তার সুযোগ নিতে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি।

নিউ ইণ্ডিয়াতে জীবনবীমা ক'রে এই জগৎ-জোড়া প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধি ও শক্তির অংশীদার হোন।

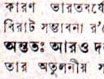

দি নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ
মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই।

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় বর্ষ — আষাঢ় — ১৩৬২

প্রবন্ধ

শিল্প ও শিল্পীর সমস্যা : সুধা বসু — ৯
প্রাচীন বাংলাগানের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত: রাজ্যেশ্বর মিত্র — ২৪
এখনকার নৃত্যকলা : শ্রীমতী ঠাকুর — ২৭

কবিতা

সম্ভাষিতাকে : গোবিন্দ ভট্টাচার্য — ১৮
রাত-কন্যা : প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় — ১৯
উত্তরবসন্ত : সুবোধকুমার গুপ্ত — ২০
ঢের শালিক দেখেছি : সত্যেন্দ্র আচার্য — ২১
স্বপ্নসঙ্গী : সন্তোষকুমার অধিকারী — ২২
পেয়ালা : ডি এইচ লরেন্স (অনুবাদ : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) — ২৩

গল্প

বাগান : সরিৎশেখর মজুমদার — ১৩
নোঙর : রবীন্দ্র সেনগুপ্ত — ৪১

উপন্যাস

পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩০

গ্রন্থপরিচয়

হীরেন বসু — ৫২

সমাজসমস্যা

হীরেন বসু — ৫৪

পরিচালক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

সমকালীন
তৃতীয় বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৬২

শিল্প ও শিল্পীর সমস্যা

সুধা বসু

আজকের দিনে জাতীয় জীবনের নানা সমস্যার একটি হল শিল্প ও শিল্পীর সমস্যা। ভারতবর্ষে —বিশেষ করে বাংলা দেশে শিল্পী ও শিল্পসৃষ্টির সংখ্যা এখনও অপ্রচুর নয়। ছবি দেখবার ও উহার রহস্য বুঝবার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের মনে বেশ খানিকটা বেড়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু তবুও আসল সমস্যাটা যেন থেকেই যাচ্ছে। ছবি দেখবার সুযোগও যে আজকাল কম তাও মনে হয়না। কারণ দীর্ঘকাল ধরেই এ সহরে চলে আসছে নানা ধরনের চিত্রপ্রদর্শনীর সুব্যবস্থা এবং প্রতি বছর এই প্রদর্শনীগুলিই তুলে ধরে আমাদের সামনে নতুন নতুন চিন্তাধারা, শিল্পীদের নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা, তুলি-কলমের কৌশল ও সার্থকতা-ব্যর্থতার পূর্ণ পরিচয়। সারা বছরে অগুণতি ছবি দেখবার সুযোগ আমরা পাই—তবুও যেন তৃষ্ণা মেটেনা—তবুও মনে হয় মন ভরেনি—কি যেন পাইনি; অনেক কিছু যেন বুঝিনি। এই না-পাওয়া ও না-বোঝার ব্যথায় মনকে ভারাক্রান্ত করে চলে আসতে হয় বলেই আমাদের দেশে চিত্রসৃষ্টির অনুপাতে চিত্রামোদী ও চিত্ররসিকের সংখ্যা অনেক কম। প্রদর্শনীতে যেয়েও দেখেছি—"দূর ছাই কি এঁকেছে বোঝাও যায় না,"—এই কথা বলে দর্শকরা ঘরের এদিক থেকে ওদিক একবার ঘুরে বেড়িয়ে চলে গেল। কেন এমন হয়? শিল্পীরাও আবার দুঃখ করে, অভিযোগ করে বলেন, "Public কিছু বোঝেনা; কোন Sympathy নেই। কি করে আর্টের উন্নতি হবে?" স্রষ্টা ও দ্রষ্টা দুজনার প্রশ্নেরই উত্তর আছে।

দর্শকের বিতৃষ্ণা বা অজ্ঞতা এবং শিল্পীর এই হতাশা—এ জিনিষ ভারতীয় জীবনের ভিত্তিগত নয়। এ হল আজকের বিযুক্ত জীবনের নতুন অঙ্গ। এদেশে কোন কালেই উপযুক্ত স্রষ্টা ও সমঝদারের অভাব ছিলনা। কিন্তু যে সমাজ ও জীবনযাত্রা কুশলী শিল্পী ও সুরসিক সমঝদার দিয়েছে—আজ আর সে সমাজ, সে জীবন নেই। শিল্পীর চাই ধ্যান, চাই উন্নত জীবন, চাই পরিচ্ছন্ন, অনাবিল, শান্তিময় পরিবেশ। চাই নিজের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও আস্থা এবং জাতীয় ঐতিহ্যে অটুট বিশ্বাস। আর দর্শকেরও থাকা চাই সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, রস গ্রহণের স্বাভাবিক ক্ষমতা, রূপের ভাষার সঙ্গে কিছুটা

পরিচয় এবং শিল্পকলা যে জাতীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট শাখা ও সুষ্ঠু ও মার্জিত জীবনযাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—একথাও সহৃদয় চিত্তে স্মরণ রাখা দরকার। স্রষ্টা ও দ্রষ্টার এইরূপ সম্মেলন হলেই রচনা শ্রেষ্ঠত্বের পর্য্যায়ে উঠতে পারে।

নিজেকে ভুলে, নিজের সভ্যতা ও পরিবেশকে ভুলে শিল্পীর রচনাও সার্থক হয়না—দর্শকের দৃষ্টিও খোলেনা। বর্ত্তমান কালের সব শিল্পীর রচনাই যে অসুন্দর ও অসার্থক তা নয়—দর্শকও যে সবাই দৃষ্টিহীন একথাও সত্য নয়। তবুও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মিলন ঘটেনা।

এ সমস্যার সমাধান দুই একটি কথায় বা সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনায় সম্ভব নয়। তবুও এখানে একখানি চিত্র কিরূপে ভাল বা শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে এবং দর্শকও কিভাবে উহা দেখলে একটুখানি অন্ততঃ রস গ্রহণ করতে পারেন তাই আলোচনার চেষ্টা করা যাক।

চিত্র আলোচনা ও বিশ্লেষণের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ আছে এবং উহা কতকটা আপেক্ষিক বা relative। দর্শকের মনের কাঠামো অর্থাৎ তাঁর instinct, emotion ও sentimentএর উপরেও খানিকটা নির্ভর করবে ছবির দোষ গুণ ও ভালমন্দের বিচার ও আলোচনা। চিত্রের সাধারণ রচনাপ্রণালী বা আঙ্কিক ব্যাকরণের মত সূত্র ধরে কিছুটা চললেও আবার কতকগুলি বিষয়ে শিল্পীর থাকে অবাধ স্বাধীনতা। আবার যিনি দেখবেন তাঁর মনের উপরেও কোন বাঁধাধরা rules and regulations চলবেনা। তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কতকগুলি বৃত্তি সহজাত ও স্বাভাবিক। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ; রংএর খেলায়, বর্ণের সমারোহে আনন্দ লাভ; তালে ছন্দে সুরে মনে উল্লাস—এগুলি প্রায় সব মানুষেরই সহজাত। কিন্তু শিক্ষার অভাবে, চর্চ্চা ও লালন-পালনের দোষে এ বৃত্তির স্ফুরণ হয়ত সকলের মধ্যে সমান ভাবে হয়না। আবার সহজাত সৌন্দর্য্য-বোধ এবং শিল্পানুরাগকেও ক্রমশঃ বস্তুর মাধ্যমে—দেখে শুনে ধরে ছুঁয়ে শিক্ষিত ও মার্জ্জিত করে তুলতে হয়। যেমন গানের সুরের বিভিন্ন ধারা, তাল মান লয় কাকে বলে তা না জানলে এবং উহাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য না বুঝলে উচ্চ মানের সঙ্গীত বোঝা যায় না; সে সুরের মূর্চ্ছনা মনকে আন্দোলিত করেনা—তেমনি চিত্রশিল্পের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচয় না থাকলে উহার সমগ্রতার বৈশিষ্ট্য ও ভাল মন্দ বুঝবার শক্তিও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যায়, মনের উপর উহার কোন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়না। আবার যেমন একখানি উচ্চমানের সঙ্গীতে গায়কের গলার সুরই শুধু তাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারেনা—তার সঙ্গে চাই আরও তাল মান লয়ের নিখুঁত পরিবেশন—তেমনি একখানি চিত্রকেও শ্রেষ্ঠত্বের পর্য্যায়ে তুলতে হলে শুধু রংএর ঝলকানি দিয়ে অথবা চিত্রিত বিষয়টির আখ্যানভাগ দিয়ে দর্শকের ভাবাবেগকে সাময়িক ভাবে জাগিয়ে তুললে হবেনা। আরও কিছুর সমাবেশ না হলে রচনা শ্রেষ্ঠ বা masterpiece হয়ে উঠবেনা।

চিত্রশিল্পের মূল কাঠামো হল রেখা। চিত্ররচনায় রেখার কারিগরী অপরিহার্য্য বস্তু। মোটা, সরু, সোজা, বাঁকা ও চেউখেলানো রেখা—এর কোনটিই তুচ্ছ নয়। শিল্পী নিজের প্রয়োজনে যথাযোগ্য ভাবে এগুলির ব্যবহার করে শুধু রেখা দিয়েই এমন ছন্দের রাজ্য, স্বপ্নের জগত সৃষ্টি করতে পারেন যা কয়েকখানি রংএর প্যালেটকেও দেবে হার মানিয়ে। কিন্তু রেখার অপব্যবহার ও

অমার্জ্জিত দুর্ব্বল গড়ন আবার শিল্পীর সমস্ত চেষ্টাকে দেয় নিষ্ফল করে। রেখারচনা সুসিদ্ধ হলেই চিত্রপটে আসে ক্ষেত্র পরিসর অর্থাৎ spaceএর কথা। কারণ Composition চোখকে পীড়িত না করে—সে সমস্যার সমাধান space ই অনেকটা করতে পারে। তারপরে হল বর্ণবিন্যাস ও আলোছায়ার প্রয়োগে চিত্র মধ্যে ঐকতান বা Harmony সৃষ্টি। চিত্রে ঐকতান সৃষ্টি হয় চার প্রকারে। প্রথমতঃ শুধু নানা ভঙ্গী ও আকারের রেখা সমাহারের দ্বারা। দ্বিতীয় হয় বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সঙ্গতি সাধন করে। তৃতীয় হল রেখা ও বর্ণের মিতালী পাতিয়ে। আর সবশেষে হয় Composition বা সমষ্টির বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটি unitএর আকার, আয়তন ও সংস্থানের মধ্যে সুমধুর গ্রন্থিবন্ধন রচনা করে। এর পরেও যে জিনিষটি দিতে না পারলে ছবির সব আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায় তা হল imaginative quality বা কল্পনার সমাবেশ। এতক্ষণ শিল্পীর হাতের কৌশল ও ওজন জ্ঞানের মধ্যেই চিত্রের ভাল মন্দ সীমিত হয়ে ছিল—কিন্তু তারপরেও দেয়ার শেষ নেই। শিল্পী যদি তাঁর কল্পনার মাধুরী দিয়ে চিত্রের ভাবসম্পদ বাড়াতে না পারেন তবে তাঁর হাতের কৌশল সবই ব্যর্থতায় পরিণত হবে। বুদ্ধির প্রয়োগে ও তুলি-কলমের কৌশলে যে চাতুর্য্য দেখানো সম্ভব হয়েছিল—ভাবসম্পদের দৈন্যে তা হবে নিষ্প্রাণ। বিশ্বস্রষ্টা মহাশিল্পী—প্রকৃতির ভাণ্ডারের তিনি অসংখ্য রূপ বা Form রচনা করে রেখেছেন। সেই সব Formএর হুবহু অনুকরণ করে পটের গায়ে লিখে রাখলে শিল্পীর নিজস্ব অবদান কোথায়? শিল্পীর মধ্যে লুকিয়ে আছে একজন স্রষ্টা, একটি কল্পনার ভাণ্ডার ও একটি সুরসিক মন। তিনি যা কিছু গড়বেন, যা কিছুর রূপ রচনা করবেন তা প্রকৃতির রূপের নির্জ্জলা অনুকরণ না হয়ে যদি নতুন রূপে, নতুন ভাবে ধরা দিতে পারে তবেই হবে সার্থক শিল্পসৃষ্টি। তবে ভিন্ন ভিন্ন যুগে, বিভিন্ন শিল্পীর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনদর্শনের বিভেদে এবং সামাজিক পরিবেশের বৈচিত্র্য অনুসারে শিল্পের আদর্শ ও রূপ পরিবর্ত্তন-শীল হতে বাধ্য। কিন্তু চিত্রের ভিত্তিগত উপাদান ও ভাবসম্পদকে উপেক্ষা করা কোন কালে, কোন অবস্থায়ই চলেনা। যুগধর্ম্মের প্রভাবে কালের পরিবর্ত্তনের মুখে পড়ে দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচির পরিবর্ত্তন ঘটলেও কতকগুলি বিষয় শাশ্বত সত্য রূপেই বেঁচে থাকে। যেমন রেখার সৌকুমার্য্য, বর্ণবিন্যাসের মনোহারিত্ব, ভারসাম্য, ছন্দলীলা প্রভৃতি যে কোন চিত্রের ভিত্তিগত গুণ। বিষয়-বস্তু বদলাতে পারে, সামাজিক আদর্শ ও রূপের ভাষা বা Formএর পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং তার ফলে হয়ত চিত্রের সমগ্র রূপটিও হয়ে যাবে আলাদা—কিন্তু ছবিখানা ভাল কি মন্দ তা বুঝবার জন্য মূলগত গুণ কয়টি বিচার করলেই চলে।

দর্শকের ও শিল্পীর দুজনার দিক থেকেই আর একটি সমস্যা আছে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। একখানি ছবি আঁকবার সময়ে ও দেখবার সময়ে শিল্পী ও দর্শক দুজনার মনেই নানা ভাবের approach আসে। যেমন একখানি দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকতে বসে শিল্পীর হয় artistic approach; আর দর্শকের মধ্যে যিনি ভক্ত তাঁর হয় emotional approach; আর দার্শনিকের হয় philo-sophical approach। সাধারণ লোকেরা চায় মোটামুটি সুন্দর, জাঁকালো বা চোখধাঁধানো রূপ অর্থাৎ দেবতা অতি সুদূরের, অতি বিরাট তিনি—আমাদের নাগালের বাইরের—সুতরাং ভয়

ভক্তির রূপটি। একখানি দৃশ্যচিত্র বা Landscape দেখবারও নানাভঙ্গী আছে। কবির দৃষ্টি খুঁজবেন এক রূপ; উদ্ভিদবিজ্ঞানী দেখবেন আর এক ভাবে আর সাধারণ দর্শক দেখবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে। পশুপাখীর মূর্ত্তি গড়নেও ঐ একই সমস্যা। Zoologistএর বিচারে যে রূপ চাইবে—hunter শিকারী দেখবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে—আর psychological pointএ যিনি দেখবেন—তিনি বিচার করবেন মূক পশুর পশুত্ব ও বুদ্ধিহীনতার ছাপ কতটা ফুটেছে অর্থাৎ animality র প্রকাশ হয়েছে কিনা। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যও একই শিল্পবস্তু ও চিত্র সকলের কাছে সমান আকর্ষণীয় ও সমান শ্রদ্ধার জিনিষ হয় না। স্রষ্টা ও দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিভিন্নতার মধ্যে আরও ভেবে দেখবার মত বিষয় আছে। আমরা সকলেই জানি যে বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে জাতীয় চরিত্র, সামাজিক আদর্শ ও মানুষের ধ্যানধারণা ও জীবনদর্শন হয় স্বতন্ত্র। তার ফলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির মধ্যেকার প্রভেদটিও হয়ে ওঠে সুস্পষ্ট। ভারতের জীবনাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে তার শিল্প ও সাহিত্য। তাই ইউরোপের ভোগী জীবনের বহির্মুখী আদর্শে গড়া শিল্পের সঙ্গে ভারতের অধ্যাত্মবাদী জীবনের অন্তর্মুখী আদর্শের শিল্পের প্রভেদ আকাশপাতাল। ইউরোপের চিত্র প্রকাশ করছে প্রকৃতি ও মানুষের বাস্তব রূপ—আলোছায়া ও বর্ণবৈচিত্র্যের সূক্ষ্ম লীলায় অঙ্গ অবয়বের ডৌলকে স্বভাবের হুবহু অনুকরণ করেই তাঁরা রূপ রচনা করে যাচ্ছেন। কিন্তু ভারতের চিত্র হল নিছক আদর্শবাদী, রেখাপ্রধান ও আলোছায়াবর্জিত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়ন খাঁটি মানুষের সঙ্গে হুবহু না মিললেও ভাবনা নেই—শিল্পী দেখাবেন অন্তরের রূপ। ভাবের ঘরের দরজা খুলে দিতে পারলেই তাঁর সিদ্ধি। এইভাবে প্রত্যেক দেশের ও জাতেরই শিল্প তাঁদের জীবনাদর্শের ভিত্তিতে স্বকীয় বিশিষ্টতা নিয়ে গড়ে ওঠে। তবে একটি বিষয়ে শিল্প বিশ্বজনীন। কারণ মুখের কথার ভাষা ও অক্ষরের ভাষার মত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, অক্ষর ও জটিল ব্যাকরণের পথে এরাজ্যে প্রবেশ করতে হয়না। যে দেশের, যে জাতের শিল্পই হোক—তার মধ্যে রংএর খেলা, রেখা রচনার কৌশল ও সাধারণ একটা Form থাকবেই। কাজেই চোখের দৃষ্টি ও অনুভূতিকে বাহন করে সোজাপথে সহজভাবে প্রবেশ করতে কোন বাধা, কোন অন্তরায় নেই। তারপরে বিষয়বস্তু, ভাবাদর্শ ও উদ্দেশ্য বুঝতে হবে সেই বিশেষ রচনাটির পেছনে যে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আদর্শ রয়েছে তার সাহায্য নিয়ে। এই দিক থেকেই শিল্পের মধ্যে থাকে বিশ্বজনীনতার আবেদন—আর শিল্প হয়ে ওঠে সনাতন। শ্রেষ্ঠ শিল্প যে দেশেরই হোক না কেন যুগ ও কালকে জয় করে শাশ্বত ও চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকে তার নিজস্ব গুণ ও ধর্ম্মের জোরে। ধর্ম্ম বিশ্বাস বদলায়, জাতীয় বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়ে যায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের রীতিপদ্ধতি স্থানচ্যুত হয়—কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্প অক্ষয়, অমর হয়ে অনন্তকাল ধরে মানুষের রূপতৃষ্ণা মিটিয়ে যাচ্ছে—তার লয় নেই, ক্ষয় নেই। এক্ষেত্রে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিকের বিচার চলেনা। মনকে মুগ্ধ করার, চিত্তকে জয় করার ও মানুষের চিন্তাকে উদ্রেক করার শক্তি যার আছে সে তার গুণগরিমা ও ভাবসম্পদের আকর্ষণী শক্তি দিয়ে দর্শকের অজ্ঞাতে তাঁর মনকে দখল করে ফেলবে। সুতরাং যে শিল্পের মধ্যে সত্যিকারের শিল্পধর্ম্ম ও গুণ আছে তাকে সম্মানের আসন থেকে সরিয়ে দেয়া অসম্ভব।

বাগান

সরিৎশেখর মজুমদার

ঠিক যেন ওৎ পেতে বসে আছেন নিবারণ। উপুহয়ে। নড়ছেন না পর্য্যন্ত। বারন্দার রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন বাগানের দিকে। চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত পড়ছে না। কাশি আসছে; কিন্তু কাশলে চলবে না। মুখে কাপড় গুঁজে প্রাণপণে চাপছেন নিবারণ।

স্ত্রী নিস্তারিণী এই কাণ্ড দেখে অবাক্। কোলের ছেলেটা বিছানা কাপড়চোপড় শপ্‌শপে করে এমন ভিজিয়েছে যে ঘুম ভেঙে গেছে তাঁর। চোখ মেলে চাইতেই প্রথমটা ভয়ে আঁতকে উঠেছিলেন। তারপর চিনতে পেরেছেন নিবারণকে। কিন্তু, এত রাত্রে এভাবে কি দেখছেন?

এগিয়ে এসে নিস্তারিণী চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন: কি গো? ···চোর?

ঠোঁটের ওপর তর্জ্জনী রেখে ইঙ্গিতে আদেশ করলেন নিবারণ—চুপ!

অগত্যা ঘরে ফিরে এলেন নিস্তারিণী। খানিক পর নিবারণ ঘরে ঢুকলেন। দেশলাই বিড়ির দরকার হয়েছে বোধহয়।

—আজ শালাদের ধরতেই হবে।

—কাদের গো?

—কাদের আবার? ঐ চোরগুলোকে। রোজ রোজ এসে বাগানের ফুলগুলো চুরি করে নিয়ে যায়। আজ দেখি, কেমন করে পালায়···।

নিস্তারিণী বিস্ময়ে গুম হয়ে গেলেন। ফুল-চোরদের ধরার জন্যে কি রাত্রে ঘুমোনোও ছাড়বেন না কি? দুটো ফুল, চুরি করবে হয়তো কচি কিশোর-কিশোরীর দল। বাড়ী থেকে হুকুম হয়েছে, ঠাকুরের জন্য কিছু ফুল যোগাড় করে নিয়ে আয়।—তাই হয়তো বেরুবে তারা। নিস্তারিণী নিজেও যে এমন কতো ফুল চুরি করেছেন ছেলেবেলায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো তাঁর, এটা বৈশাখমাস। এই বৈশাখে পুণ্যিপুকুর করতেন তিনি। সারা বৈশাখমাস ধরে। সে কি আনন্দের দিন সব। তিনিও তো একদিন ওদেরই মতো অন্ধকার থাকতে বিছানা ছেড়ে উঠে দাদার সঙ্গে ফুল চুরি করেছেন···

—হ্যাগা, ঘুমোও না—কি সামান্য দুটো ফুল, তার জন্যে···

নিবারণ একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন: সামান্য মানে?

নিস্তারিণী চুপ করে গেলেন। দরকার নেই কথা বাড়িয়ে। হঠাৎ কোথা থেকে যে এই উটকো বাগানের নথ এসে ঘাড়ে চাপলো, ভেবে পাননা নিস্তারিণী। ঐ বাগান টব আর গাছ-গাছড়া নিয়ে নিত্যি মন কষাকষি চলেছে দুজনের। বাপ-ঠাকুর্দ্দার আমলের ভিটে, সামনে প্রায়

চার কাঠা জমি খালিই পড়েছিল অনেকদিন। বিয়ের আগের খবর জানা নেই। কিন্তু বিয়ের পর পঁচিশটা বছর ত কাটলো···কই, একদিনও ত বাগানের সখ জাগেনি? গত পাঁচ-ছ মাস কি রোগেই ধরেছে! নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—বাগান, বাগান আর বাগান! আগে যেলোক সন্ধ্যা হতেই বাড়ী ফিরতো মাছ মিষ্টি তরকারি পত্তর সঙ্গে নিয়ে, সেই লোক এখন নিত্যি বাড়ী ঢুকবে গাছ, সার বা টব নিয়ে।

নিবারণ বিড়ি টানছেন বসে বসে। চারবছরের ছেলে তোতা আবার গোঙাতে সুরু করেছে। কানের যন্ত্রণা! সন্ধ্যার দিকে দারুণ কান্নাকাটি করেছিল সে। আহা, কি কষ্ট পাচ্ছে! ও-বাড়ীর মাসীমার সঙ্গে পরামর্শ করে কানে গরম রসুন-তেল দিয়েছিলেন নিস্তারিণী। বোধহয় উপকার দিয়েছে। তারপরই ঘুমিয়ে পড়েছিল তোতা।

নিবারণ এসবের খবর রাখেননি। বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন: এ-ই, চুপ কর্।

নিস্তারিণীর ইচ্ছে হলো, দুকথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু না, থাক্।

কোনও কথা না বলে উঠে পড়লেন। খবর কাগজ জ্বালিয়ে রসুন-তেলটা গরম করবেন। আবার দেবেন তোতার কানে। কি মনে করে নিস্তারিণী হাতঘড়িটা তুলে দেখলেন, সময় কত। সাড়ে তিনটে? কি কাণ্ড!

—আচ্ছা, তুমি কি বলো ত? কটা বেজেছে দেখেছো?

—কটা?

—সাড়ে তিনটে। তোমার ফুল চুরি করতে কি এখন আসবে? ঘুমোও দেখি।

মনে মনে চমকে উঠলেন নিবারণ। সময় বুঝতে পারেননি। কিন্তু তবু স্ত্রীকে বুঝতে দেবেননা। তাই বললেন: না গো, বলা যায়না, কোন্ ফাঁকে ঢুকে টপ্ টপ্ করে ফুলগুলো ছিঁড়ে সরে পড়বে। তুমি বরং এক কাজ করো। মাদুরটা বারন্দায় বিছিয়ে দাও।

নিস্তারিণীর রীতিমত রাগ হলো। মুখে প্রকাশ করলেন না। সপাৎ করে মাদুরটা ঝেড়ে পেতে দিয়ে দুম্‌দুম করে পা ফেলে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর ঘুমন্ত ছেলেটাকে হ্যাঁচকা টান মেরে দুই চড় কসিয়ে গজ্‌গজ্ করতে লাগলেন: হারামজাদা, তোযকটা শেষ করে দিলে···।

নিবারণ নিজেই একটা বালিশ টেনে নিয়ে এমনভাবে শুলেন যাতে বাগানের ওপর নজর থাকে। তোতা গোঙাচ্ছে। কি যন্ত্রণা কানের!

নিবারণ সত্যি সত্যি বাগানে ডুবে গেছেন গত ছ-সাত মাস। এছাড়া আর কোন চিন্তা নেই তাঁর। প্রত্যেক গাছের শাখা, পাতা, ফুল, কুঁড়ি প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গটিকে মনে রাখেন। তাদের কথা ভাবেন। আগামী ভোরে কোন্ শাখায় কটা কুঁড়ি জাগবে, কোন্ গাছের পুষ্টির জন্ত কিরকম সার দরকার, এই তাঁর চিন্তা। ফুলেরও আকাশ আছে। উত্তাপে ওদের দেহ ম্লান হয়। স্পর্শজ্ঞান আছে তাই। শ্রবণশক্তি আছে, তাই বায়ু অগ্নি আর বজ্রের শব্দে ওরা ভয়ে বিশীর্ণ হয়। নিবারণ বই ঘেঁটে ঘেঁটে জেনেছেন ওদের প্রাণবত্তার কথা, ওদের ইন্দ্রিয়-চেষ্টা, জীবোচিত অন্যান্য

সাত্তর কথা। যতো জেনেছেন, ততো মায়ায় পড়েছেন। মনে মনে নিস্তারিণীর কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন: তুমি কি বোঝোনা নীরু, কেন আমি জেগে বসে থাকি। আমার বাগানের ফুল নিয়ে যাবে বলে? না গো না, তা নয়। আহা, ওদেরও যে প্রাণ আছে, আশা আছে, আকাঙ্খা আছে, কতো স্বপ্ন আছে জীবনে! যে-ফুলটিকে ছিঁড়বে তার···

বাগানের ঝোপে খস্‌খস্ করে আওয়াজ হতেই চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। নিবারণ চেঁচিয়ে ওঠেন—কে? তারপর ভুল ভাঙে, ছুটো বেড়াল!

আবার মাদুরে এলিয়ে পড়েন গুন্‌গুন্ করে নিতান্ত মনে-মনে গান ধরেন নিবারণ:

'দেখো বনের ভালোবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপনারে বিকাশে'

ধীরে ধীরে আকাশ ফর্সা হলো। চোরগুলো সেদিন আর এলোনা। অভ্যাসচালিত নিবারণ মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা বাগানে গিয়ে ঢুকলেন।

ছেলেগুলো ঘুম থেকে উঠেই চ্যাঁ-ভ্যাঁ আরম্ভ করেছে। এর আব্দার, ওর চীৎকার—নানা রকমের অত্যাচার। নিস্তারিণীর মুখটা থম্‌থমে। আজ একটা প্রলয়কাণ্ড করবেনই করবেন। সংসারটা কি শুধু তাঁর একার? স্বামীর কোনও কর্তব্য নেই—কোনো ঝক্কি নেই? একেবারে নিশ্চিন্দি হয়ে আছেন বাগান নিয়ে!···

ছেলেরা যতো আব্দার ধরে, নিস্তারিণী ততো তাদের দুম্‌দাম্ মারেন! ওদিকে উনুনের আঁচ পড়ে যাচ্ছে। মেয়েগুলো দেখেও দেখছে না। গতরে যেন তুঁয়োপোকা লেগেচে। তোতাটা কি কাতরান কাতরাচ্ছে!

—এই ইরা, এই বাসন্তী—থেকে থেকে চিৎকার করে ডাকছেন নিস্তারিণী। দয়া করে আবার ঝি মহারাণী আসেনি। মাসের মধ্যে পনেরো দিন কামাই। তাও আবার কাজের সময় গজগজানি। একরাশ এঁটো বাসন পড়ে রয়েছে।

ছাই শালপাতা নিয়ে নিস্তারিণী বসলেন সেগুলো মাজতে।

—নিজে বাগান নিয়ে মেতেছেন, আবার সঙ্গে একটা মেয়েকেও আটকে রেখেছেন···এই ঝর্ণা—ঝর্ণা—!

ঝর্ণা বাবাকে বাগানের কাজে সাহায্য করে। গোড়া খোঁড়ে, জল দেয়, পাতার পোকা বাছে। অন্যান্য দিন নিস্তারিণী অত আপত্তি করেন না। কিন্তু আজ তাঁর অনেকদিনের জমা রাগ লাভার মত পাহাড় ফুঁড়ে বার হয়ে আসে বুঝি। তাই ঝর্ণাকে ডাকা। নিবারণ কিন্তু রেগে উঠলেন: ওটাকে আবার কি দরকার? দেখছোনা এদিকে কাজ করছে বাগানে?

নিস্তারিণী একেবারে ফেটে পড়লেন। ঝনাৎ করে হাতের এঁটো বাটি ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন: রইলো সব। আমি পারবোনা তোমাদের বাসন মাজতে। তোমার সংসারে আমি ঝি-গিরি করতে আসিনি।

ব্যাপারটা হয়তো আরও খানিকটা গড়াতো যদিনা মোহন ডাক্তার এসে পড়তেন। নিস্তারিণী মেজছেলেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে ডেকে আনতে। তোতার কানের একটা ব্যবস্থা করা দরকার, তাই।

—নিবারণবাবু! ও নিবারণবাবু!

খালি গায়ে খুরপি হাতে নিবারণ জবাগাছের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়ালেন।

—এই যে ডাক্তারবাবু। কি ব্যাপার? এতো সকালে?

—এতো সকালে ডাক পড়লো কেন সেইটেই ত জানতে এলাম। কি হলো তোতার?

নিস্তারিণী ঘোমটা টেনে বাসন ছেড়ে উঠলেন। রাগে গরগর করছেন তখন স্বামীর কথা শুনে। এমন নির্বিকার লোক! তোতার জন্য ডাক্তার ডাকা দরকার, এই সামান্য দায়িত্ববোধও কি লোপ পেলো? আগুন লাগুক বাগানে!

—এসেছেন ভালোই হয়েছে। অনেক দিন থেকে ভাবছি আপনাকে ডেকে আমার বাগানটা দেখাবো।

ডাক্তার এগিয়ে গেলেন। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন বাগান। নিবারণ উৎসাহিত হয়ে ফুলের পরিচয় দিতে লাগলেন। কোন্ ফুলের কি বৈশিষ্ট, বাংলা নাম কি, ইংরাজী নামই বা কি, কোন্ ফুল কতো রংএর হয় ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব কিছু আওড়ে যেতে লাগলেন। এটা প্যান্সী, পাঁপড়ীর ভেতরটা দেখুন···ঠিক যেন কোটরগত চোখদুটো পুট্‌পুট্ করছে! এগুলোর কি বিউটি দেখছেন? নাম 'নটি মেরিয়াটা'—মানে, দুষ্টু মেরী, ফরাসী ফুল। সোনালী জমি, তারওপর মেরুণ রংএর পুরু ছোপ্—মেরিগোল্ড গ্রুপের ফুল! ···আচ্ছা, এবার এদিকে আসুন। বলুন তো কি নাম এই ফুলের?

—কি জানি মশাই ওসব নাম-ফাম।

নিজেই উত্তর দিলেন নিবারণ: এ্যান্টিরহিনাম স্ন্যাপড্রাগন! বাংলা নাম হাঙ্গরমুখা। নানা রং-এর হয় এই ফুল। এমনই ওর গড়ন যে মধুমক্ষিকা এসে বসবেই বসবে ওদের এই পুষ্পমুকুটে। আর অমনি খুলে যাবে মধুভাণ্ডারের পথ···

বিস্মিত হয়ে শুনচেন মোহন ডাক্তার। কতো রকমের ফুল। কতো নাম! মর্নিং গ্লোরি, হেভেন্‌লি ব্লু, হাউণ্ডস্ টাং, ক্যান্টারবেরী বেল্‌স্! শেষের নামটা বড় ভালো লেগেছে ডাক্তারের। সত্যি ছোট ছোট ঘণ্টার মত দেখতে। যেন মনে হয়, পবিত্র গির্জার এই ঘণ্টাগুলো এখনই হাওয়ায় দুলে দুলে মিঠে সুরে বেজে উঠে সকলকে ডাকবে, বলবে—আয়! শান্তিময়ের দর্শন পাবি আয়!

—কাকাবাবু! মা ডাকছেন—

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো, দেখি কি হয়েছে তোতার।

ডাক্তারবাবু দোতলায় চললেন। সিঁড়িটা বড় নোংরা। কোথা থেকে যেন দুর্গন্ধও আসছে। ডাক্তার বেশ বুঝলেন, তিনি যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন সেই সময় বারন্দা ও ঘর পরিষ্কার করার তাড়া পড়ে গেছে। যখন তিনি ঘরে ঢুকলেন তখনও দাগপড়া ছেঁড়া চাদরটা বদলানোর চেষ্টা অর্ধসমাপ্ত

হয়েছে মাত্র। ফলে ছেঁড়া তোষক বেরিয়ে পড়েছে। ডাক্তার বেশ অবাক হলেন। নিবারণের ত অবস্থা বেশ স্বচ্ছল! তবে এমন কেন?

তোতা কানের যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদছে। ইস্, কি ভয়ঙ্কর ফুলেছে সারা মুখটা। কানের কাছে মুখ বাড়াতেই ভস্ করে পচা পুঁজের গন্ধ নাকে ধাক্কা দিল। ডাক্তার দম বন্ধ করে নিলেন। ···Oh! how neglected! নিবারণবাবু! কই, নিবারণবাবুকে শীগ্‌গীর ডাকো।···

নিবারণ তখনও বাগানে। চিৎকার করছেন: সূর্য্যমুখী ফুলটা খাম্‌চে ছিঁড়েছে কে? শীগগীর বল্। কে ছিঁড়েচে?

মেজছেলেটা কাঁদো-কাঁদো মুখ করে দাঁড়িয়ে: কে ছিঁড়েছে আমি জানিনা!

নিবারণ রেগে আগুন হয়ে গেছেন। ছেলেটার কান ধরে দু'তিন চড় কষিয়ে বললেন: তোমরা হারামজাদারা কেউ জানোনা? তবে কি ভূতে এসে ছিঁড়লো?

মোহন ডাক্তার এবার বারন্দায় বেরিয়ে এসে ব্যাগ্রভাবে ডাকলেন: নিবারণবাবু! শীগগীর আসুন!

ভয়ে জড়সড় হয়ে একপাশে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে নিস্তারিণী। কি হলো তোতার? ছেলেটা বাঁচবে ত!

নিবারণ বেশ বিরক্তমনে ঘরে ঢুকলেন। তখনও তাঁর ফুলের শোক যায়নি। ডাক্তার গড়গড় করে ইংরাজীতে বলে গেলেন: নিবারণবাবু করেছেন কি? ছেলেকে বাঁচানো কঠিন হবে যে! আপনি বাগান নিয়ে মেতে আছেন আর এদিকে ছেলের এই অবস্থা। ওটাইটিস মিডিয়া, কম্‌প্লিকেটেড কেস্। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সূর্য্যমুখী কে খাম্‌চে নিলো তাই নিয়ে চেঁচামেচি করছেন আর এদিকে এই বাগানের মর্নিং গ্লোরিটাকে ডেথ্ এসে তুলে নিয়ে পালাবার উপক্রম করেছে সেদিকে খেয়াল নেই?······ছিঃ!······"

নিস্তারিণী কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

ডাক্তারের চাবুকে এই প্রথম যেন ঘুম ভাঙলো নিবারণের। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন!

···এই বাগানের মর্নিং গ্লোরি···! কথাটা তোতার কচিমুখের সঙ্গে মাখামাখি করে প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো।

সম্ভাবিতাকে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

যদিও ছায়ার মত সেই পথে নিত্য আনাগোনা
স্খলিত স্বপ্নের সাথে কোনোদিন দেখা হয়ে গেলে
হৃদয়-সমুদ্রে শুনি তুফানের করতালি বাজে
জীবনের ভোগতৃষা সময়ের পানপাত্রে ঢেলে
একটি চুমুক দিই ; তারপর চরম ঔদাস্য নিয়ে
প্রশ্ন করি—খবর-কি—দিনগুলো কাটছে কেমন,—
বিশুদ্ধ ভদ্রতা-বোধ—যেন এই পথচলা মনে
এমনি পথিক আসে অফুরন্ত ! দ্রুত আলাপন
সেরে নিয়ে পা বাড়াই সহরের সজাত অফিসে
হয়ত দশটা দশে লেটমার্ক পড়ল খাতায়।

জানি এই অভিনয় মরুবুকে আনবেনা মেঘ
কোনোদিন। কতদিনে তন্দ্রালসা চোখের পাতায়
নামবে সবুজছায়া স্বপ্নে দেখা অন্য পৃথিবীর
ইচ্ছার নক্ষত্র আজো সেই আশা মনে মনে নিয়ে
সূর্যের সারথী হয়।

বরং এসব ফেলে যদি
জীবনের দেনাগুলো এতদিনে দিতাম মিটিয়ে
হয়ত এপথ হ'ত সংকটের আবর্তে আবিল
তবু এই বিপর্যয়ে অস্তসূর্য খুঁজে পেত মিল॥

রাত-কন্যা

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কে তুমি নির্জন নারী এক আকাশ-অন্ধকার দিয়ে
চুপি চুপি এসে, দূরে তারাদের জোনাকি জ্বালিয়ে
সময়ের সমুদ্রের কিনারায় বসে পা ভেজাও
স্বপ্নের সবুজ ঢেউয়ে ! হাতছানি দিয়ে ডাক দাও
বারবার আমাকেই ! কি চাও আমার কাছে তুমি ?
বলো, আর কতক্ষণ এ-মনের মর্মরিত ভূমি
ছুঁয়ে যাবে ? বলো কন্যা, কেন এই নিদালী-নিশীথে
ঘুম কেড়ে নেবে বলে, দোলা দিলে প্রাণের নিভৃতে।

তোমাকে বেসেছি ভালো : কিন্তু জেনো জীবনের দেনা
শুধতে হবেই হবে, সকালের সূর্য শুনবে না
তোমার আমার কথা ; কাজের আওয়াজ বুকে বয়ে
কড়া নেড়ে যাবে দ্বারে, শঙ্কা ভরে এ-ক্লান্ত হৃদয়ে।

আর না ঝরিয়ে তবে ঝিরিঝিরি স্বপ্নের-মৌসুম,
বরং মিনতি রেখে চোখে আঁকো ঘুমের কুমকুম॥

উত্তরবসন্ত

সুবোধকুমার গুপ্ত

ফুরোলো ফাল্গুন, এখন গান থাক;
এখন রাত নেই—সকাল সূর্যের,
থেমেছে গুন্‌গুন্, এ-মনে বৈশাখ।

জীবন গম্‌গম্, সময় তূর্যের,
পৃথিবী লাঞ্ছিতা—আর্ত তার স্বর,
উঠেছে হাহাকার, শুনেছি: কই কই!

তবুতো ধান হয়, এ-মাটি উর্বর
এবং আলো ফুলে এ-গ্রহ থৈ থৈ,
দেখেছি ধ্রুবতারা; শপথ: ভয় নেই

মায়ের জ্বল্‌জ্বল্ কপালে কুমকুম্,
আমরা পৃথিবীতে আনবো এক সেই
শিশুর মত ঠিক সিন্ধুতুধঘুম।

ঢের শালিক দেখেছি

সত্যেন্দ্র আচার্য

এখন কোথায় তারা, সেইসব শালিকের দল?
শূন্যাকাশে শুধু ছাওয়া নিপাতনে বিভাজন ফল।
শালিক কোথায় গেল, সেই সাথে রৌদ্র নীলিমা,
যুবকেরা বিগতায়ু—কচি ঘাসে করুণ আর্তির অরুণিমা।

নির্জন রাত্রির ঘরে তবু ওড়ে শুভ্র পাখা মেলে
অপরূপ অসংখ্য শালিক। স্মৃতির ধূসর রং অবহেলে
সে ধূর্ত শালিক ভাসে মুক্ত স্বচ্ছ সুষম আকাশে,
যুবকেরা বিগতায়ু—চোখে বিগতদিনের যৌবনেরা হাসে।

মুক্তস্বচ্ছ আকাশের গায়ে বিবর্ণ অক্ষর লেখে
যুবকেরা নিরাকারে। নির্জনে নিভৃতে তবু হয়ত অনেকে
চোখ রাখে পরিণাম-হাঁসে। সে হাঁস বিবর্ণ রং। আর,
শালিকের দল?
কি জানি, কোথায় গেল! শূন্যাকাশে শুধু ছাওয়া
শূন্যের ফসল।

স্বপ্নসঙ্গী

সন্তোষকুমার অধিকারী

একটি নিঃশব্দ দিনে সঙ্গ তব কামনা করেছি
একান্ত আড়ালে ;
কোলাহল স্তব্ধ হলে পৃথিবীর কোন এক অস্থির বিকালে,
কোন গোধূলির ছিন্ন বিষণ্ণ আকাশে,—
যে আকাশে ঢেউ নেই, জীবনের মেঘসূর্য্য নেই,
শুধু এক অতৃপ্তির খণ্ড অবকাশে।

কামনা করেছি পূর্ণ আসঙ্গবিলাসে
স্বপ্নে……দিনের আলস্যে।
যদি এজীবনে সেই মুহূর্তের পরশমণিতে
সোনা হয়ে উঠে থাকে মুহূর্তসময়,……
পৃথিবীর বিশ্রান্তি বেদনা ক্ষোভ থাক পড়ে থাক,
আকাশ নিশীথে
পরিত্যক্ত হোক আশা, ব্যথার্ত হৃদয়
ভুলে যাক অনুভূতি।
শ্রাবণের সঞ্চারী মেঘের স্বপ্ন ভরে থাক পৃথিবী আকাশ,
শুধু তব ভ্রূভঙ্গবিলাসে
তোমার আসঙ্গে
চেতনাকে আমিও হারাই।

একটি নিঃশব্দ দিনে শব্দহীন দিনের আকাশে
আলো আর তিমিরের অনুভূতি এক হয়ে যায়।
দুরন্ত জীবন আর পৃথিবীর মাঠ বন নদী
ভুলে যাই ; সঙ্গিহীন অনন্ত সময়
একটি মুহূর্ত মাত্র,…সঙ্গ তব
পাই আমি যদি।

পেয়ালা

ভি এইচ্ লরেন্স

পেয়ালার বুক কালো সুচিকন হয় যেন নিরুপম,
গলে যায় যায় এমন নিশীথ-আঁধারের ফোঁটা সম।
পেয়ালার ঠোঁটে অধর ছোঁয়াই পান করিবার তরে,
যে কালো পেয়ালা আপন চরণে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে॥

অনুবাদ : সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাচীন বাংলাগানের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত

রাজ্যেশ্বর মিত্র

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সে প্রায় একশ বছর হল। এই একশ বছর পরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান বাংলা গানের চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশ বছর পূর্বের বাংলাগানের (মানে বাংলা কাব্যসঙ্গীতের) চেহারা কেমন ছিল তা কি আমরা জানি? আমরা তা জানিনে বললে অত্যুক্তি হবে না এবং তার খোঁজ নেবার চেষ্টাও করি নি। আমাদের দেশই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে প্রাচীনের পটভূমিকায় নবীনের প্রতিষ্ঠা দেখতে কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেন না, বর্ত্তমানকে আমাদের যতটুকু ভাল লাগে ততটুকু নিয়ে থাকি, তারপরে যাকে একদিন তুলে ধরি তাকেই অনায়াসে ফেলে দিই বিস্মৃতির অতল গর্ভে। এর ফলে আমাদের দেশে কিছুই পাওয়া যায় না, সব তথ্যই ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে ওঠে। এই ভাবেই প্রাক-রবীন্দ্রযুগের সঙ্গীতের একটা রূপ প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। শুধু প্রাক-রবীন্দ্রযুগই বা বলি কেন রবীন্দ্রযুগের সঙ্গীতের যে সব নানাভিমুখী ধারা ছিল আজ তার স্বরূপও তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জানতে বা বুঝতে হলে এই পিছনের এবং সমসাময়িক এই দুই ইতিহাসকেই জানতে হবে, নইলে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে শিক্ষা আমাদের পূর্ণ হবে না।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশ বছর আগের কথা—আচ্ছা আরো পঞ্চাশটা বছর যোগ করে দেড়শ করুন। এই দেড়শ বছর আগেকার সঙ্গীত যে কী ছিল তা এখন অনুমান করে নিতে হয়। আমাদের জানা গানের মধ্যে এখনকার প্রচলিত ধ্রুপদের শুধু একটা উল্লেখেই পাওয়া দু-একখানা বই-এ। তখনকার ধ্রুপদ ছিল সংস্কৃতঘেঁষা অথবা পুরোপুরি সংস্কৃতই বলতে পারেন। আর যে সব গান ছিল তা সেই পুরোনো যুগের প্রবন্ধসঙ্গীত। তাদের রূপ যে কিরকম ছিল এখন তা গেয়ে বোঝাবার উপায় নেই। নমুনাস্বরূপ একখানা গান উদ্ধৃত করছি। জয়দেবী প্রভাব তখনও বাংলা গানে খুব প্রকট সেটাও বোঝা যাবে।

জয় জগত বন্দিনী, বিদিত নৃপনন্দিনী রাধিকা চন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী।
শ্যাম মনোরঞ্জিনী, ধৈর্য্যভয় ভঞ্জিনী, কঞ্জ খঞ্জনমীন গঞ্জি মৃগলোচনী॥
কান্তজিত দামিনী, পরম অভিরামিনী, ভামিনী সিন্ধু কন্যাদি মদমর্দিনী।
মঞ্জুমৃদু হাসিনী, ললিককলভাষিনী ভুবনমোহিনী ললিতাদি মুদবর্ধিনী॥
সভগশৃঙ্গারিণী, নবনববিহারিণী, বৃন্দাবিপিনবিনোদিনী গজগামিনী।
রাসরসরঙ্গিণী, মধুরতরঙ্গিণী, সকলরমণীমণি নরহরি স্বামিনী॥

ঝান্তা ঝাং ঝান্তা তাথা চিতকতধুন্না ছামিক ত্রিপও
তাকতা তা থৈয়া।
সারিরিগম্ পমগ মম্মগরি সাস্‌মাতি অই তেন্না তেন্না
তে নাং অই ঐ আ॥

রীতিমতো আলাপ বিস্তারের সঙ্গে সর্গম যোগ করে এসব গান গাওয়া হত।

এর অব্যবহিত পরেই এলেন ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদী ঢঙ আমাদের জানা আছে কিন্তু একে ঠিক কাব্যসঙ্গীতের রূপ বলব না এবং কাব্যসঙ্গীতে রামপ্রসাদী প্রভাবও খুব বেশী নয়। ভারতচন্দ্র অনেক গান লিখেছিলেন। এঁর জীবিতকাল ১৭০৮ থেকে ১৭৬০ সাল। ভারতচন্দ্রের গানে আধুনিক রীতির স্পর্শ প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। এঁর গানগুলি হচ্ছে টপ্পার যুগের গানগুলির অগ্রদূত। যেসব সুরে এবং তালে টপ্পাগুলি গাওয়া হত সেকালে ভারতচন্দ্রের গানেও সেই সব সুর-তাল ব্যবহৃত হয়েছে। গানের ভাষা দেখেও মনে হবে টপ্পায় আগের যুগের ভাষা।

খাম্বাজ—দ্রুত ত্রিতালী.

একি অপরূপ রূপ তরুতলে
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে।
মোহন চিকণকালা		নানাফুলে বনমালা
কিবা মনোহরতর বরগুঞ্জা ফলে।
বরণ কালিমা ছাঁদে		বৃষ্টিছলে মেঘ কাঁদে
তড়িত লুটায় পায় ধড়ার আঁচলে।
কস্তুরী মিশালে মাখি		কবরী মাঝারে রাখি
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে,
ভারত দেখিয়া যারে		ধৈরজ ধরিতে নারে
রমণী কি তায় যায় মুনিমন টলে।

এঁরই অব্যবহিত পরে নিধুবাবুর অভ্যুদয়। বর্তমান কাব্যসঙ্গীতের ইনিই হলেন প্রতিষ্ঠাতা। নিধুবাবুর কাব্য এবং টপ্পারীতির অতিশয় অনুরাগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রসঙ্গীতে টপ্পার প্রয়োগ ঠিক নিধুবাবুর রীতিকেই অনুসরণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানি ধ্রুপদের রীতি গ্রহণ করেছেন কিন্তু হিন্দি টপ্পার রীতি গ্রহণ করেন নি—তিনি নিয়েছিলেন নিধুবাবুর প্রবর্তিত টপ্পার রীতি। হিন্দি টপ্পা ভেঙে যে তিনি গান রচনা করেন নি এমন নয় কিন্তু প্রধানত রবীন্দ্রনাথের টপ্পার স্টাইল বা গায়কী বাংলা টপ্পার, হিন্দির নয়। নিধুবাবুর রীতিতে টপ্পার তানে একটা বিশেষ আন্দোলন আছে যা হিন্দি ঢঙে নেই। অনেক সময় একটি সুরে দাঁড়িয়েও টপ্পার কাজ করা হয় নিধুবাবুর কায়দায়। এই সব বিশিষ্ট ভঙ্গীগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীতে সম্পূর্ণ বর্তমান।

নিধুবাবুর গানে সুরের বাঁধুনি যেমন পাকা তেমনি মনোহর তাঁর কাব্যরচনা।

নিধুবাবুর জীবদ্দশাতেই টপ্পার কিছু রকমফের হয় এবং এর থেকে একটি লঘুভঙ্গীর সৃষ্টি হয়

যা খেমটা বা আড় খেমটা চালের গান বলে পরিচিত। এই রকম হবার একটি কারণ আছে। সে যুগে এমন অনেক গান রচিত হতে লাগল যাতে পুরোপুরি টপ্পার প্রয়োগ একটু অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে পড়ে। তাই তার সুললিত ছন্দ এবং গতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য টপ্পাকে খানিকটা ভেঙে আনতে হল। এই ঢংটি গোপাল উড়ের যাত্রায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং এর প্রভাব তখনকার গানে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। এই রীতির উদাহরণস্বরূপ "ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া" গানটির উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের বহু গানে এই ধরণের আড় খেমটার প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর বাল্যকালে এই রীতিটার খুবই প্রচলন ছিল। তাঁদের ছেলেবেলার গানের একটা লাইন তিনি লিখেছেন—"বেদেনী এক এলো পাড়াতে সাধের উল্কি পরাতে"—এই সব গানও এই আড় খেমটার ঢঙেই পড়ে। সে সময় এই শ্রেণীর গান অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত লঘু হয়ে গিয়েছিল। সে যুগের অনেক নামকরা গান এই রীতিতে গাওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" গানটির উল্লেখ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ গান গাইতেন—তাঁর রচনায় এর উল্লেখ আছে। সরলা দেবীর শতগানে এ গানটির একটি ভিন্ন সুরের স্বরলিপি আছে, কিন্তু সেটি প্রচলিত সুর নয়, তাঁর নিজস্ব সুর। এই আড় খেমটার বিভিন্ন ভঙ্গী ছিল এবং এই সব নানা ভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন।

এই ঢঙের সঙ্গে ক্রমেই উচ্চতর কাব্যসঙ্গীতের সংযোগ ঘটে একটি চমৎকার রীতি গড়ে উঠেছিল। রাগসঙ্গীত এবং টপ্পার স্পর্শে এই সব গান অতিশয় মর্মস্পর্শী হত। রবীন্দ্রযুগের প্রাক্কালে এই ধরণের গানের মধ্যে অক্ষয় চৌধুরীর রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য,—বিশেষ করে তাঁর "কেনই বা ভুলিব তোমায়, কে ভোলে হৃদয় দানে" বা "নিত্যত না রইতে পেরে দেখিতে এলেম আপনি" এই ধরণের গানগুলি।

এই সব গানে আর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে সেটি হচ্ছে সঞ্চারীর বৈচিত্র্য। প্রথম দিকে টপ্পার যুগে অন্তরাতেই গান সমাপ্ত হত। তার পরে অন্তরাগুলি সাধারণত পর পর একই সুরে গাওয়া হত—ক্রমে, ধীরে ধীরে কাব্যসঙ্গীত যখন নানা বৈচিত্র্য নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে উঠল তখন তাতে সঞ্চারীর বৈচিত্র্য দেখা দিল। এই ধরণের সুরের যে কি বিপুল প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর পড়েছে তা তাঁর এই রীতিতে রচিত গানগুলি বিচার করলেই বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টিতে সঞ্চারী একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। সুর-প্রয়োগে তাঁর অপূর্ব দক্ষতার প্রমাণ তাঁর প্রত্যেকটি গানের সঞ্চারী।

প্রাচীন বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত এই ভাবেই গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের খেমটাচালের রচনা "ও কেন চুরি করে চায়," "মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে," "হেলা ফেলা সারা বেলা," "আজ তোমারে দেখতে এলেম," "বনে এমন ফুল ফুটেছে," "বুঝি বেলা বহে যায়," "বঁধু তোমায় করব রাজা" এবং আরও বহু টপ্পাভঙ্গির গান যখন শুনতে পাই তখন তাঁর আগের যুগের এই ধরণের বহু গানের সুর মনে গুন গুন করে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বাংলার যে প্রবহমান সঙ্গীতের রসে পরিপুষ্ট তাঁর রচনায় তার স্বাক্ষর অতি মধুর ভাবে রেখে গেছেন।

এখনকার নৃত্যকলা

শ্রীমতী ঠাকুর

একদা আনন্দ-বিলাসী মনীষীদের অবসর যাপনের খেলা হলেও গত তিরিশবছরে নৃত্য আমাদের দেশে ললিতকলার মর্যাদালাভ করেছে আর আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে তার হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাসিকাল আর লোকনৃত্যকলার মৃতপ্রায় ঐতিহ্যকে আবার অনেকটা ফিরিয়ে আনা গেছে। জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে লোকনৃত্যনাট্যগুলি, বেশ খানিকটা জায়গা দখল করেছে তারা সহরের রঙ্গালয়ে। ভারতীয় নৃত্য-অ্যাকাডেমী আর নৃত্য-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ভারতবর্ষের নানা জায়গায়। সৌখীন বা পেশাদারী শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠীগুলি সারাবছর ধরে নানা নৃত্যঅনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছেন। এই সমস্ত আয়োজন বিচার করে দেখলে মনে হয় আমাদের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ। কিন্তু ললিতকলাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তা হলে মাঝে মাঝে তার মূল্যগুলি যাচিয়ে নেওয়া প্রয়োজন এবং তাকে নূতন রূপ দেওয়া দরকার। আমাদের নৃত্যের জগতে আজ এমন একটা সময় এসেছে যখন নতুন ধারণার বৃহত্তর পরিধিতে নৃত্যকে বিকশিত করে তুলতে হবে।

এখনকার নৃত্যকলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে নৃত্যনাট্যগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তা। মঞ্চ-সাজানোর অভিনবত্ব, অপূর্ব দৃশ্যপটসৃষ্টি, আলোকসম্পাতের নূতন নূতন কৌশল এবং আধুনিক বেশ ও রূপসজ্জার প্রবর্তনার ফলে প্রাচীন রীতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অধিকাংশ নৃত্যানুষ্ঠানেই নানাধরণের ঢাকঢোল আর কণ্ঠসঙ্গীতের বদলে অর্কেষ্ট্রাই প্রধান হয়ে উঠছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর দৈন্য পদে পদে প্রমাণ করছে আমরা নূতন কল্পনার জগতে যেন দেউলে হয়ে পড়েছি। মনে হয় সেই পুরানো আমলের শিব-পার্বতী, রাধা-কৃষ্ণ কিম্বা মহাকাব্য পুরাণের গল্প ছাড়া আমাদের যেন আর কোন সম্বল নেই। কদাচিৎ কোন নতুন ভাবধারা একটা নবীনত্ব আনে কিম্বা আশার সঞ্চার করে। তা ছাড়া আধুনিক কালের প্রযোজকেরা নৃত্যের আঙ্গিকগত দুর্বলতাকে প্রদর্শন-কলার (showmanship) দিয়ে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেন। কোন অনুষ্ঠান করাতে গেলে শিল্পীদের যে নৃত্যের সমস্ত কৌশল সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করানো দরকার এ ব্যাপারে কারুরই যথেষ্ট মনযোগ নেই। এই জন্যেই বেশীরভাগ নৃত্যঅনুষ্ঠানই শখের নৃত্যের (amateur) স্তর পেরোতে পারেনা। একথা যদিও ঠিক যে আমাদের মধ্যে কয়েকজন ক্লাসিকাল রীতির ধারক আছেন যাঁরা বিস্ময়বস্তু আর আবেগকে অপূর্ব কৌশলে বিচিত্র ছন্দ আর অঙ্গভঙ্গীতে রূপায়িত করেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্লাসিকাল শিল্পী 'খাঁটি রীতির' ধারণায় এমনি বাঁধা পড়ে আছেন—তাঁরা এতই গতানুগতিকতার ভক্ত যে রূপ আর বস্তুর যথাযথ প্রয়োগের ব্যতিক্রম—তা ছন্দেরই হোক বা পোষাকেরই হোক—তাঁরা অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করেন। নৃত্যের আঙ্গিক টিকমতো আয়ত্ত না করে

মঞ্চসজ্জা আর কায়দা-দেখানোর চেষ্টা যেমন ভারতীয় নৃত্যকলাকে প্রাণহীন ও পঙ্গু করে দিচ্ছে ঠিক তেমনি 'খাঁটি রীতির' নাম করে পুরানো পদ্ধতির বাঁধন দিয়ে শিল্পীর সৃষ্টি-প্রেরণাকে হত্যা করে আমাদের নৃত্যকলাকে স্থবির করে রাখা হয়েছে। জীবনের অন্তর্নিহিত আগ্রহকে প্রকাশ করে নৃত্যকলা আর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই তার নব নব প্রকাশ। জনসাধারণের প্রাণের মধ্যে থেকেই তা বারবার নতুন রূপে আপনাকে বাইরে প্রকাশ করে। নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে জীবনের যে বিভিন্ন গতি নৃত্যে তারই প্রকাশ। শুধু দেহের ললিতভঙ্গিমা ও তার গতির ছন্দ নৃত্যের শেষ কথা নয়। অঙ্গভঙ্গীতে ভাবকে রূপায়িত করার ক্ষমতা আছে মানব দেহের—সেই মানবদেহই নৃত্যের মাধ্যম।

আধুনিককালের নৃত্যকলাকে অচল অবস্থা থেকে উদ্ধার করে, তাতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে হলে, সমস্ত সমস্যাটিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেকটি শিল্পেই বিষয়বস্তু আর আঙ্গিক, দুই-ই আছে। যে শিল্পীর অন্তরে সৃষ্টির প্রেরণা কাজ করছে, তাঁর নূতন ধারণা যদি গতানুগতিক শিল্পরীতির মধ্যে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ না পায় তাহলে সে শিল্পী সৃষ্টির তাগিদেই নূতন মুদ্রা নূতন ভঙ্গী তৈরী করে নেন। ক্লাসিকাল রীতিতে শিক্ষিত শিল্পী নিয়মের বাঁধন থেকে নড়বার স্বাধীনতা পান না বলেই, কল্পনার অবাধ প্রকাশ তাঁর মধ্যে কেবলি বাধা পায়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিষয়বস্তু গৌণ হয়ে যায়, এবং তার প্রকাশ রঙহীন ফিকে হয়ে পড়ে।

দেহ সঞ্চালনের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও ধারণা নৃত্যশিল্পীর প্রথম থেকেই থাকা চাই। ক্লাসিকাল রীতির বিপুল ঐশ্বর্য বাতিল করা এর উদ্দেশ্য নয়, বরং নতুন পদ্ধতির সাহায্যে তাকে আরো ব্যাপক আরো সমৃদ্ধতর করে তোলাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় ব্যালের ক্ষেত্রে ইসাডোরা ডানকানের আগে পদ্ধতির বৈধতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন নি। "যে পদ্ধতিতে নৃত্য শিক্ষা চলেছে তা কি শিল্পীর দেহের সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছে।" —এই প্রশ্নও তাঁর আগে আর কেউ করেনি। সৌভাগ্য আমাদের, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা, শিল্পীদেহের গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ-সচেতন ছিলেন, আর তাঁদের সুবিপুল অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য একটি বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শ্রেণীবিভাগ করেছেন, দেহের প্রতিটি অংশ কতবার সঞ্চালন করা যেতে পারে তার সংখ্যা আর তার বিশেষ প্রকৃতির নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন, দেহভঙ্গী আর ছন্দের সম্বন্ধ এবং তাদের বিচিত্র মিশ্রণ ও সংযোগের কথা সুবিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করেছেন। নৃত্যের বিষয়বস্তু "রস"-এরও ব্যাপক অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা তাঁরা করেছেন। মঞ্চ, পোষাক, শিল্পীর দেহ, সঙ্গীত-নৃত্যঅনুষ্ঠানের সব প্রয়োজনীয় অংশই তাঁদের কাছে যথাযথ গুরুত্ব পেয়েছিল। তবু সদাশিব, নন্দিন, কোহানা প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রমাণ করছে প্রাচীনকালে নৃত্যকলা কত প্রাণবন্ত ছিল। শিল্পগুরুরা পথনির্দেশ দিতেন কিন্তু সৃষ্টার অবাধ স্বাধীনতা ছিল নিজের মনের মত নূতন পদ্ধতি অনুসন্ধান করার—শুধু রসবিকারের অপরাধটুকু বাঁচিয়ে চলতে হতো। দৃষ্টির প্রসারতা হারিয়ে আজ আমরা বদ্ধ জলায় তলিয়ে গেছি। দাসি আট্টম, মোহিনী আট্টম, কথক কথাকলি, রাসলীলা ও অন্যান্য বিবিধ রীতির নৃত্য-প্রদর্শকরা প্রত্যেকেই

নিজস্ব রীতিকে ভরত-নাট্যশাস্ত্র অনুমোদিত বলে প্রচার করতে ব্যস্ত। মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেকটি প্রাচীন রীতিই একটি বিশেষ মূলগত সূত্রকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশেষ স্থান আর কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে তারই থেকে একটি বিশেষ নৃত্যধারার উদ্ভব হয়েছে। এমনি করেই শিল্প সমৃদ্ধ হয়। বিশেষ একটা ছাপ মেরে দিলে ব্যবসাগত লাভ হতে পারে কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে তার কোন মূল্য নেই। "কেমন করে হলো" এটা খুব বড়ো কথা নয়, কিন্তু "কি হলো" আর "আদৌ তা হলো কিনা" শিল্পের ক্ষেত্রে এইটেই ছোলো আসল কথা।

ছন্দিত আন্দোলনে নৃত্যশিল্পী ভাবনাকে প্রকাশ করেন—মানুষের প্রাণবন্ত দেহ তার প্রকাশের মাধ্যম। ক্লাসিকাল শিল্পীদের দেহ কতকগুলি বিশেষ অঙ্গসঞ্চালনের রীতির অনুগত হওয়ায় নানা-ধরণের ভাবকে রূপ দিতে অসমর্থ। সেই বিধিবদ্ধ দেহ-সঞ্চালন তাই, ভাবের ওঠা-নামা, সঙ্গতি-সংঘাত, বিরোধ-বিস্ময়কে পরিণত নৃত্যরূপ দিতে পারে না। ক্লাসিকাল নৃত্যশিক্ষা নৃত্যশিল্পীর দেহকে কতকগুলি অভ্যাসের বশীভূত করে, কয়েকটি পেশী অঙ্গ কতকগুলি পেশীর সঙ্গে সমত রক্ষা করে। তাই নৃত্যশিল্পীর দেহের এমন নমনীয়তা থাকা চাই যাতে শিল্পী সমস্ত দেহটি স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারেন। সৃষ্টি করতে করতে স্রষ্টা যে শুধু প্রাচীন সূত্রগুলিকেই বাতিল করেন তা নয়, নিজের তৈরী পুরানো নৃত্যরূপও বাতিল করে দেন সময়ে সময়ে—শুধু নজর রাখেন যাতে তাঁর সৃষ্টির ধারাবাহিকতার মধ্যে অসঙ্গতি না এসে যায়। কবির সৃষ্টি কালে আর ভাস্করের সৃষ্টি স্থানে, কিন্তু নৃত্যশিল্পী স্থান কাল ছুয়েই তাঁর সৃষ্টি প্রদর্শন করেন। ছন্দোময় দেহভঙ্গী নৃত্যশিল্পীর ভাষা; তাঁর সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের স্বচ্ছন্দ ও সতেজ প্রকাশের জন্য নৃত্যশিল্পীকে এই ভাষা আয়ত্ত করতে হবে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নূতন দৃষ্টির অনুসন্ধানী হতে হবে। নৃত্যকৌশলের নিখুঁত গতিতে শিল্পী নতুন রীতি উদ্ভাবন করতে পারেন। গতানুগতিক রীতির বন্ধনকে অতিক্রম করে তাঁর নিজের উদ্ভাবিত পদ্ধতি তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হবার সুযোগ দেয়। এরই ফলে নৃত্য-কৌশল ও ভাবধারার মিল হয়ে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক হয়ে এক অপূর্ব শিল্পকলার সৃষ্টি হয়। শিল্প-সাহিত্যের প্রত্যেক স্রষ্টাই এই সত্যটি জানতেন। রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার কথাই ভেবে দেখা যাক। ক্লাসিকাল আর লোকসঙ্গীতের সুর নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা করলেন; কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা সমস্ত বন্ধন ভেঙ্গে কল্পনার অবাধ আনন্দে পুঁথিগত সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অভূতপূর্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে।

অতীতের মিথ্যা মোহে আর আধুনিক সস্তা চমক-লাগানো ঢঙে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। সৃষ্টিশীল ললিতকলার প্রশস্ত দিগন্ত আমাদের ধারণা কিম্বা কল্পনা কোনটাই স্পর্শ করতে পারছে না। সব বাধা দূর করে নৃত্যকলাকে আধুনিক কালের সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি প্রধান অঙ্গ করে তুলতে হবে।

পুরশ্চরণ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপিন বিয়ে করেনি। তাই ভুবনমোহিনী সত্যজিৎকে শাসন করলে আগে বলতেন, তোর কি করে মায়া দয়া থাকবে? ছেলে মেয়ের বাপ তো হলিনে।

কিন্তু শান্তির প্রতি বিপিনের স্নেহের অন্ত নেই। কেন যেন মেয়েটা একটু হাসলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, প্রশংসার অন্ত থাকে না—শান্তি মাই গঙ্গা জলের মত সরল ওর মনে কেউ কষ্ট দিও না। একথা বিপিন শান্তির বাবা হরিহর, বাড়ীতে নিজের মা, বৌঠান, আর ওবাড়ীর মিত্তির গিন্নীকে প্রায়ই বলে থাকেন।

আর সত্যজিৎ সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই বিপিনবাবু বিকৃত মুখভঙ্গী করে বলতেন—ছেলে নয় তো পিলে! দাদার, এই ছেলেটা বংশের নাম ডোবাবে। যত বয়স হচ্ছে তত বাঁদর হচ্ছে!

বাঁদর হচ্ছে সত্যজিৎ! সন্ধ্যেবেলায় এখনও ছাদের ওপর একা একা আঠারো বছরের রোগা ফর্সা একটু ঢাঙ্গা ছেলেটা গালে হাত দিয়ে বসে বসে কি ভাবে। আজও ঠাকুমার কাছে শোনা রামায়ণ মহাভারত আর রূপকথার বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী ওর চোখের সামনে ভাসে। সেই ছোটবেলায় ঠাকুরমার কাছে শোনা রামায়ণ ভালো লাগতো না—রাম বড় একচোখা লোক! সীতাকে কত কষ্ট দিলো! দশরথও তেমনি; একটুকু বুদ্ধি নেই। সে যদি দশরথ হতো, কখনও কৈকেয়ীর কথা শুনতো না। ঠাকুরমাকে বলেছে তোমাদের রাম ভাল নয়—সব প্রজাকে ভালোবাসে না। সীতা-লব-কুশও তো প্রজা?

ঠাকুমা কাছে টেনে বলেছেন, ভালোবাসতো বই কি! খুব বেশী করে বাসতো, রাম যে স্বয়ং ভগবান! ভগবান যে সকলকে ভালো বাসেন, সকলের মঙ্গল করেন।

—রাম ভগবান, কৃষ্ণ ভগবান।—সত্যজিৎ-এর কেমন সব গোলমাল হয়ে যেতো। শান্তির কাছে আগের দিনে প্রশ্ন করেছে সত্যজিৎ—কতগুলো ভগবান আছে শান্তিদি?

—দূর বোকা! কতগুলো থাকবে কেন, ভগবান একজন।

—তাহলে রামকে ভগবান, কৃষ্ণকে ভগবান, শিবকে ভগবান বলে কেন?

—তা জানিস না বুঝি? ভগবান যে বহুরূপী। তাই তো মনে হয় অনেকগুলো ভগবান! বুঝলি কিছু? শান্তি কাছে টেনে নিয়ে বলতো।

সেসব দিনে কতবারই আপন মনে ভাবতো বাবাকে জিগ্‌গেস করবো। কিন্তু না—হয়ত বোকা বলবেন কিংবা ধমক দিয়ে বলবেন—নেঃ আর বকতে হবেনা, ঘুমো।

বাবা যেন কি! হাসি পেতো। সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনদিনই বাবাকে দেখতে পেতো না। সন্ধ্যেতে বাড়ী আসতে না আসতেই হরিনামের আসর বসবে। শ্যামভাই, কাকু, বাবা, ও বাড়ীর জ্যেঠু, দাদু আসবে, আর বলাইদা, গুপীদার সঙ্গে ঠাকুমা আর শান্তিদিকে এসময় পাওয়া যায়। ঠাকুরের পূজায় যোগাড় করবে। তাই এ সময়টা ভারি খারাপ লাগতো। পড়তে হতো তার ওপর বাবা ডাকতেন, শ্যামভাই ডাকতো হরিনাম করতে।

—সতু কোথায় গেলি? এদিকে আয়—

সতু সাড়া দিতোনা এ ডাকে, চুপ করে বসে থাকতো পড়ার ঘরে। তারপর একসময় শ্যামভাই ডাকতেন—সত্যানন্দ···এস ভাই। তুমি না এলে আসর জমবে না যে।

বিপিনকাকা ততো কিছু তখন বলতো না, একবার খালি হেঁড়ে গলায় ডাকতো—সকলে ডাকছে কানে যায় না বুঝি? ওরে শান্তি দেখতো রে কোথায় গেল সতেটা···?

শান্তি আসতো পড়ার ঘরে। ঘুমের ভানটা অনেকদিন আগে আয়ত্ত করেছিল সত্যজিৎ। টেবিলে মাথা রেখে মট্‌কা মেরে পড়ে থাকতো সে। শান্তি কাছে এলে মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে আস্তে করে ডাকতো—এই দুষ্টু, ওঠ দেখি! সবাই ডাকছে চ' হরিনাম করবি!

—না আমি যাবো না। হরিনাম করে কি হবে?

—কি হবে? আনন্দ হবে···নাচবি! চ' ভাই···

—সন্দেশ নিয়ে এসো তা'হলে।

শান্তি হেসে ফেলতো। নিজের বাঁধা আঁচলটা আস্তে আস্তে খুলতে খুলতে বলতো, দুষ্টুমি সত্যিই বড় বাড়ছে তোর! কাকু ঠিকই বলেন। নে তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।

এদিকে শ্রীখোলে বলাইচাঁদ চাঁটি দিতে আরম্ভ করেছে। এখনি হরি-সংকীর্তন আরম্ভ হবে। নিত্য নাম-গানের এই সান্ধ্য-আসরটি অনেকদিন থেকেই মুখুজ্যে বাড়ীতে বসছে। দীননাথ মুখুজ্যে প্রথম যৌবনেই এই আসরটির পত্তন করেছেন। সেদিন এ বাড়ীর সব থেকে ছোট ছেলে সতুকে তার পড়শী দিদি হাত ধরে নিয়ে আসতো। চুপটি করে ঠাকুর ঘরের দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে থাকতো ভিতরে যেতো না।

তারপর শ্যামভাই-এর মৃদু হাসির সঙ্গে হাতছানি ওকে আসরের মাঝখানে একসময় টেনে নিয়ে যাবে। শ্যামভাই-এর হাসির সঙ্গে হাতছানি সত্যজিৎ-এর সমস্ত আড়ষ্টতা আর বিরক্তিকে দূরে সরিয়ে দিত। সত্যজিৎ শ্রীখোলের বোল কি বলতে চাচ্ছে তা যেন বুঝতে পারতো, মনটা ব্যাকুল হয়ে ব্যক্ত হতে চাইতো। সুরের দোলা দেহ-মনে অভূতপূর্ব আবেশ এনে দিতো সত্যজিৎ-এর। স্বরে থাকতো আর্দ্রতা। শ্রীখোলের মিঠে বোলের তালে তালে ওর সুমধুর কণ্ঠস্বর উঠতো নামতো সবার কণ্ঠস্বরের আগে আগে—কত আকুতি, কত ব্যকুলতা—সত্যজিৎ-এর চোখে জল ঝরতো:

'গৌর এইবার এইবার আমায় দেখা দাও···'

বিপিন কাকাও নয়নমুদে ঐ দুরন্ত ফাঁকিবাজ ভাইপোটাকে সুরের অগ্রদূত বলে অনুসরণ করতে দ্বিধা করতেন না।

ঠাকুর ঘরের দরজার পাশে বসে ভুবনমোহিনী চোখ বুঁজে হরিনাম শোনেন। পাশে শান্তিও থাকে হরি-সংকীর্তন শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

ভুবনমোহিনীর বড় ছেলে দীননাথ মুখুজ্যে প্রথম চাকরীতে বহাল হয়েই এ আসরের পত্তন করেন। অনেক দিনের সাধ ছিল দীননাথের, কিন্তু বন্ধু শ্যামভাই-এর ইচ্ছা ছিল আরো প্রবল। শ্যামভাই তখন সবে নবদ্বীপ থেকে ফিরেছে পাঁচ বছর বাদে। দীননাথই সেদিন খোঁজ করে শ্যামভাইকে ফিরিয়ে এনেছিল কোলকাতায়। শ্যামভাই-এর বাবাকে প্রতিশ্রুত দিয়েছিল দীননাথ, শ্যামভাইকে ফিরিয়ে আনবে।

দীননাথ শ্যামভাইকে ফিরিয়ে এনেছিল তারপর আর ছেড়ে দেয় নি। শ্যামভাই-এর বাবা অনেকদিন গত হয়েছেন, তাই ওর বাঁধন বলতে কিছুই নেই। তবু শ্যামভাই এ পাড়ায় আছে, নিত্য নাম-গানের আসরে আসে। বোধহয় বাঁধন একটা আছে, আর সে খবর দীননাথই শুধু জানে।

দীননাথ যে সংসারে থেকে এত নির্লিপ্ত কেন তা বোধহয় ভুবনমোহিনী বুঝতে পারেন। ছোট বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন দীননাথের তিনি, শান্তিপুরের হরিশ তর্কলঙ্কারের মেয়ের সঙ্গে। ছেলের বয়স তখন ১৫ আর মেয়ের আট। যোগাযোগ হঠাৎ-ই হয়ে গেল, ভুবনমোহিনী বেশ খুসীর সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দিয়ে ছিলেন। ছেলে তখন সিদু পণ্ডিতের টোলে আর ডাফ্ সাহেবের স্কুলে পড়ে। সঙ্গী শুধু শ্যামা। সব সময়ই শ্যাম আর দীনুকে একসাথে দেখা যেত—বন্ধুরা ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল 'মানিক জোড়'। শ্যামভাইয়ের বাবা দীননাথকে নিজের ছেলের মতই ভালো-বাসতেন। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ দীননাথকে শ্যামভাইয়ের সঙ্গে বসিয়ে পড়িয়েছিলেন, কীর্তন করতে তিনিই শিখিয়েছিলেন, তিনিই সন্ধ্যার মুখে নিজেই বসতেন ; শ্রীখোল নিয়ে শ্যামভাই আর দীননাথের সঙ্গে গলা মেলাতো আখর দিয়ে।

এমনি সময়-ই হঠাৎ একদিন দীননাথ শুনলো তার বিয়ে। খবরটা শুনে শ্যামভাই হাসলো, বললে, যাক্ বৌঠানের হাতে মাঝে মধ্যে ভালো-মন্দ খাওয়া যাবে। শ্যামভাই-এর বাবা বললেন, খুসী মনেই বিয়ে কর। মন তার করোনা, তোমার মায়ের যখন ইচ্ছে তখন মঙ্গলই হবে।

দীননাথ কিছু বলে নি। আজকের শান্ত ধীর নির্লিপ্ত মুখচ্ছবির সঙ্গে সেদিনের মুখচ্ছবির যথেষ্ট মিল আছে, শুধু সময়-কাল-ঘটনায় পোয়ে যায়। মুখমণ্ডলের রেখাগুলি বয়বৃদ্ধের ঘোষণা জানায়।

দীননাথ নিয়ম-মাফিক সবকিছুই করে—কর্তব্য বোধে এতটুকু শৈথিল্য নেই। বাড়ীতে দীননাথ থাকলে বোঝা যায়। ও নিজে কিছু না বললে কি হবে, সারা বাড়ীটা ঠিক ওরই মত ঠাণ্ডা থাকে। এমন কি বিপিনও যথেষ্ট সংযত থাকে, অথচ দীননাথ কোনদিন এতটুকু রাগ, বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। চিত্ত-চাঞ্চল্য বলতে যা বোঝায় তা শুধু দীননাথের আসে কীর্তন করবার সময়।

দ্বিজবালা ছোট্ট কণে বৌ হয়ে যেমনটা দেখেছিল দীননাথকে, ঠিক তেমনটি আজও দেখছে ; কোন পরিবর্তন নেই স্বভাবের, বয়সটাই যা বেড়ে গেছে, আজও তেমনি শান্ত আর গম্ভীর। কতবারই

তো জিজ্ঞেস করেছে দ্বিজবালা—কি ভাবো তুমি বল তো? সারাটা সময়ই যেন কিছু ভাবছ! এমন মানুষও হয়···?

এ পক্ষের কিন্তু কোন উত্তর আসে না। শুধু একটু ম্লান হাসি, ঐটাই যেন উত্তর।

দ্বিজবালা আর বেশী কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে না। কেন পারে না সে প্রশ্নও নিজেকে কোনদিন করতে পারে নি সে। পণ্ডিতের মেয়ে দ্বিজবালা, ছোট বেলায় হাতে-খড়ি হওয়ার পর থেকেই মার কাছ থেকে রামায়ণ মহাভারত শুনে শুনে মনের মধ্যে পুণ্য সতী-সাবিত্রী-সীতা-অরুন্ধতীর কথা অলজলে হয়ে থেকে গেছে। তারপর বিয়ের দিনের কথাটা—বর আসছে—উলু আর শাঁখের শব্দ! কত লোকজন, কত উদ্দাম চীৎকার, নানান খাবারের গন্ধ, আত্মীয়-স্বজনের কথাবার্তা ঠাট্টা ইয়ার্কি! সেই বিচিত্র পরিবেশ ও উপবাসের ক্লান্তির সঙ্গে চোখ-জড়ানো ঘুমের মাঝে মার কথাটা আজও যেন শুনতে পায় দ্বিজবালা। হঠাৎ কোথা থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে মা বলেছিলেন—মামণির আমার সত্যি শিবের মত বর হয়েছে! দেখিস্ মা, শিব যেন চিরকাল তুষ্ট থাকেন।

শিবের তুষ্টি সাধন সম্বন্ধে যত আগ্রহ না থাক, অসন্তোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ দ্বিজবালা। কোনদিনও এতটুকু ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না দীননাথের প্রতি দ্বিজবালার ব্যবহারে। বোধহয় একটি দিনও বেশী কথা বলে ঐ শান্ত গম্ভীর স্বামীর মনের মধ্যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুলতে চায় নি সে। একটির পর একটি করে পাঁচটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে নিজের মনের মত করে মানুষ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাও তো বছর কয়েক যেতে না যেতেই ছেলেমেয়েগুলো তাকে ছেড়ে কেউ ঠাকুমা, কেউ কাকা, কেউ বাবাকেই সর্বস্ব বলে জেনেছে। ব্যবহারেও এসেছে বেশ ব্যবধান। সেজন্য দ্বিজবালার মনে কোন ক্ষোভ নেই, দিব্যি আনন্দের মাঝে দিন কেটেছে সকলের-পরিচর্যা করে। তবে বড়-ছেলে ভাস্করের নাকে ছাড়া একদণ্ড চলতো না। বাড়ীতে থাকলে ওর 'মা' ডাকের জন্য সব সময় দ্বিজবালাকে সজাগ থাকতে হয়।

আজকাল বাড়ীতে ভাস্কর থাকে খুব কম। ছোটবেলা থেকেই দিদিমার কাছে মানুষ। পাঁচ-বছরের ছেলে যখন ভাস্কর তখন দ্বিজবালা রোগে শয্যাশায়ী। দিদিমা এলেন এ বাড়ীতে, ভাস্করের সমস্ত খুঁটিনাটির ভার পড়ল দিদিমার ওপর। ভাস্করও দিদিমাকে ছেড়ে থাকতে পারল না। ঠাকুমার থেকে অনেক ভালো গল্প বলতেন দিদিমা ভাস্করের কাছে শুয়ে। তাই ইদানীং সে আর ঠাকুমার কাছে শুতে চাইতো না। ঠাকুমা ডাকলেই সে বলতো, তুমি তো আলাদীনের গল্প জানো না, আমি শোবো না তোমার কাছে।

ভুবনমোহিনী হেসে বলতেন, ওরে পাজি! দিদিমার কাছে দু'টো গল্প শুনেই সব ভুলে গেলি? আমি যে এতকরে নোংরা ঘাঁটলুম, ক্ষীর-চাঁচি খাওয়ালুম সবই বৃথা হোল! দেখলে বেয়ান, ছেলের আক্কেলটা!

দিদিমা হাসতেন। ভাস্কর দিদিমার আঁচলে মুখ লুকিয়ে বলতো—শোবে চলা দিমা!

সেই ছোট্ট ভাস্কর আজ বড় হয়েছে। এখনও কৃষ্ণনগরে দিদিমার কাছে থাকে। বি, এ,

পড়ছে। ছুটিতে আসে কোলকাতায় বেড়াতে। আর এখানে মাকে ছাড়া আর কাউকে ঠিক আপন করতে পারে না। এমনকি ভুবনমোহিনীকেও নয়। দ্বিজবালা কত বলেছেন—হ্যাঁরে খোকা, ঠাক্‌মাকে এড়িয়ে চলিস কেন বল্ তো? ওঁর মনে কষ্ট হয় না বুঝি?

ভাস্কর হেসে উত্তর দেয়—কই এড়িয়ে চলি না তো? কত খাবার চেয়ে খাই, কত গল্প হয়··· ও তোমার মনের ভুল।

"মনের ভুল? হবেই বুঝি বা, কে জানে! দ্বিজবালা বেশী ভাবতে চায় না কোনদিনই, বিশ্বাস আসে সহজেই আর থাকেও অটুট হয়ে।

ভুবনমোহিনীর সঙ্গে ভাস্কর কথা বলে, খাবার চেয়ে খায়, কিন্তু চার পাঁচ বছরের ভাস্করের মত নয়। সেই আধো আধো বুলিতে সেদিনের নাতি-ঠাকুমার হৃদ্যতা আজও দ্বিজবালার চোখের সামনে ভাসে।

মেজছেলে স্মরজিৎ তো কাকা-গত প্রাণ। কাকার সঙ্গে খাওয়া, শোওয়া, লেখা-পড়া একই সঙ্গে একই ঘরে। এবার আই, এ পরীক্ষা দিয়েছে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেওঘরে গিয়েছে। বোধহয় শান্তির পরই বিপিন স্মরজিৎতের কোন কথা এড়াতে পারে না। এখানে ছায়-অন্যায় নেই, সম্পূর্ণ অন্ধ বিপিন। এই তো বছর দুই আগে স্মরজিৎ সিগারেট খাচ্ছিল শান্তির ছোটভাই শিবনাথের ঘরে। সত্যজিৎ দেখতে পেয়ে কাকাকে গিয়ে বলেছিল—মেজদা সিগারেট খাচ্ছে কাকা।

বিপিন সত্যজিৎকে ধমক দিয়ে বলেছিল—মেজদা সিগারেট খাচ্ছে তা তোর কিরে হতভাগা? যা পড়তে বসগে···পড়াশুনা নেই খালি ডেপোমী। কে কি কোথায় করছে কেবল তারি তদারকি?

সত্যজিৎ মারের ভয়ে কাকার সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

অথচ স্মরজিৎকে এ ব্যাপার নিয়ে কোন ধমক-ধামক করেনি বিপিন। হয়ত কিছুদিন গেলে নেশার অপকারিতা সম্বন্ধে এক নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা বিপিন তার মেজভাইপো স্মরজিৎকে শুনিয়েছে।

দ্বিজবালার কাছে এসব ব্যামেলা আসে না। সত্যজিৎ কিছু বলবে না, স্মরজিৎ কিছু বলবে না, বলবে শুধু একজন, সে ছোল সত্যজিতের ছোট বোন চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী ঠিক মায়ের মত। মার সব কিছুই পেয়েছে। রূপের দিকে থেকে মাকেও ছাড়িয়ে গেছে চন্দ্রাবলী। ওকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়: কাঁচা সোনার মত গায়ের রং; দেহের কোথাও এতটুকু খুঁত নেই। বয়স বাড়ছে, সারা শরীর নব কলেবরে আরো সুন্দর হয়ে উঠছে। ওর পায়ের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন সারগামের এক একটি পর্দা। ওর হাতের প্রতিটি সঞ্চালনে যেন সঙ্গীতের সূক্ষ্ম মীড়ের কাজ। ওর সরু কটিদেশ আর ভারি নিতম্বের মৃদু বিলম্বিত ছন্দ গজমতীকেও হার মানায়। ওর গ্রীবার ভঙ্গিমায় কবিতার হিল্লোলিত ছন্দ। ওর চোখ অবাধ সমুদ্রের মত অনন্ত দিশাহীন ভাবের দিশারী। আর মাথায় কৃষ্ণ-তমালের মত কালো কুঞ্চিত কেশরাশি চন্দ্রাবলীকে আরো সুন্দর করে তুলেছে। এ যেন সেই গোপাঙ্গনা শ্যাম-বিরহিনী চন্দ্রাবলী—শ্যামভাইও একথা বলে ভাব-সমুদ্রে ডুব দেন।

দুই

অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে হবে। দীননাথের মত ছায়-নিষ্ঠ অথচ নির্বিকার পুরুষ একদিকে, অন্যদিকে শ্যামভায়ের মত কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা প্রেমিককে ঘিরে উত্তর কোলকাতার একটি পাড়ার একধারে কয়েকটি মানুষ বেশ শান্তিতে একটির পর একটি দিন পার করে বিংশ শতাব্দীর এক খরা দুপুরের নিঝুমতায় হঠাৎ যেন চমকালো।

কৃষ্ণনগর থেকে ভাস্কর এলো হঠাৎ রুক্ষ শঙ্কাজড়িত মুখে। সোজা দ্বিজবালার কাছে এসে ম্লান হেসে বলল, মা তোমাকে কেষ্টনগর যেতে হবে।

দ্বিজবালা উৎকণ্ঠিত হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন ফ্যাল ফ্যাল করে।

ভাস্করের মায়া লাগে, কষ্ট হয়, মার এই উৎকণ্ঠিত দিশেহারা মুখ দেখে। বললে—দিদিমার কদিন হোল একাঅরী, বললে তোমাকে নিয়ে যেতে। তাই নিতে এলাম।

দ্বিজবালা এই একটি ব্যাপারে বরাবরই অস্থির হয়ে পড়েন। মা-বাবার একটু কিছু অসুখ হবার খবর পেলে দ্বিজবালাকে আর ধরে রাখা যায় না এ বাড়ীতে। যাকে হোক সঙ্গে নিয়ে ছুটবেন কৃষ্ণনগর।

—জ্বর ছাড়ে নি! কদিনের জ্বর? তুই যখন এলি তখন জ্বর কত? —অনেক গুলো প্রশ্ন করে বসলেন দ্বিজবালা।

—ভয়ের কিছু নেই, ভালো আছেন। কাল সকালের ট্রেণে চল।

—কাল সকালে কেন? এখন কোন ট্রেণ নেই?

—এখুনি যাবে?

—হ্যাঁ। চ আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবি—দ্বিজবালা আর দাঁড়ালেন না, সোজা গিয়ে ঢুকলেন নিজের ঘরে। যা হাতের কাছে ঠেকল তাই টেনে নিয়ে পোঁটলা বেঁধে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

তারপর ভাস্করকে বললেন, নে চ দেরী করিস্ না বাবা।

—বাবাকে কিছু বলে যাবে না?

—কোন দরকার নেই। এখন চ দেখি।

ভাস্কর আর কিছু বলতে সাহস পেল না। এখানে কোন জোর, কোন আব্দার, কোন অনুরোধ নেই।

—পৌঁছে একটা খবর দিও বৌমা। বেয়ানকে ভালো দেখে গোবিন্দর ইচ্ছায় ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো। দ্বিজবালা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই ভুবনমোহিনী বললেন।

দ্বিজবালা একবার শুধু ঘাড় নেড়ে বগলে পোঁটলা নিয়ে তর তর করে নীচে নামলেন। মার অসুখের খবর। দ্বিজবালা কি আর এবাড়ীতে সেই শান্ত লক্ষ্মী-প্রতিমার মত নিঃশব্দে আপন কাজে বিভোর থাকতে পারেন। দ্বিজবালা কোনদিন যা পারেননি আজ বয়স্থা গিন্নী হয়েও তা পারলেন না।

—দুগ্‌গা···দুগ্‌গা।—ভুবনমোহিনী কোমরে হাত দিয়ে পেছন পেছন এলেন সিড়ি পর্যন্ত।

দ্বিজবালা চলে গেলেন কৃষ্ণনগর বিকেলের আগেই। স্বরজিৎ বাইরে গিয়েছে। ছেলের মধ্যে ঐ সত্যজিৎ। একটু বাদেই কলেজ থেকে ফিরবে। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। বয়স সবে সতেরো পার হয়েছে। কিন্তু বয়স বাড়লে কি হবে, আগের সেই সাত আট বছরের ছোট্ট ছেলেই আছে সত্যজিৎ। আগের মতই এলোমেলো। ছেলেমানুষী আর দুষ্টুমীতে ভুবনমোহিনী কিংবা শান্তিকে ব্যস্ত করে তোলে।

ভুবনমোহিনীর কদিন থেকেই শরীরটা খারাপ চলছিল। তবু ছোট নাতি-নাতনির জন্যে নিজেই জলখাবার করতে বসলেন। দ্বিজবালা চলে যেতেই। চন্দ্রাবলীও স্কুলে, সে আসবে সত্যজিতের একটু পরে। স্কুলের গাড়ী নানান্ যায়গা ঘুরে ওকে পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে দিয়ে যায়। তারও জলখাবার চাই। মাকে দেখতে না পেলে খেতেও চাইবে না। মুখ ফুটে কিছু বলবে না—এত লাজুক মেয়ে যে নিজের বাড়ীটাও যেন শ্বশুর বাড়ী! ঝি-টা এখনও এলো না—ভাবতে ভাবতে ভুবনমোহিনী নিরামিষ হেঁসেলে কয়লা দিলেন।

শরীর যেন আর বইছে না। ময়দাটা কোন রকমে মেখে রাখলেন, কিন্তু নেচি কেটে যেই বেলতে লাগলেন অমনি কম্প দিয়ে জ্বর এল —আর বসতে পারলেন না! আশির ওপর বয়স হয়েছে, তাই কম্প দিয়ে জ্বর এলে আর বেশীক্ষণ সহ্য করে বসতে পারেন না। তবু আজ চেষ্টা করলেন। কোন রকমে খানকয়েক পরোটা বেলে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উনুনে ভারি চাটুটা চাপালেন বটে কিন্তু আর কিছু করবার মত সাধ্যি নেই ভুবনমোহিনীর। কাঁপুনিটা বেড়ে উঠছে—হাত পা থেকে আরম্ভ করে দন্তহীন মাড়িটা পর্যন্ত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। উনুনের পরম মাটিতে হাতদুটো দিয়ে উত্তাপ নিতে থাকলেন—যদি কাঁপুনি কমে আয় তাহলে ছেলেমেয়ে দুটোর খিদের মুখে কিছু দিতে পারবেন। ঝি যেন এলো! হ্যাঁ কলতলায় চৌবাচ্চাটা খুলে দিল যেন, যাক্ তবু শান্তিকে ডেকে আনলে ওদের খাবারটা করে দেবে।

কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে ভর দিয়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়ালেন ভুবনমোহিনী।

—কত্তামা কোথায় গো?—ঝি ডাকে।

ভুবনমোহিনী আস্তে আস্তে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপা গলায় বললেন—কোথায় যে যাস্ বাপু তোরা! একবার ও বাড়ী গিয়ে শান্তি দিদিমণিকে ডেকে আন তো!

—তোমার কি হোল কত্তমা? কাঁপছ যে ঠক্ ঠক্ করে! জ্বর এলো নাকি?

—হ্যাঁ···হ্যাঁ···এখন যা দেখি তুই। আর আমি বকতে পারছি নে।—বসে পড়লেন ভুবনমোহিনী।

—গিন্নীমাই বা কোথায় গেল, দেখছি না তো? যাই শান্তি দিদিমণিকে ডেকেই আনি।

শান্তি এলো কিছুক্ষণ পরে। কিন্তু রান্নাঘরের রোয়াকে বৃদ্ধা ভুবনমোহিনী তখন আর বসে নেই, শুয়ে পড়েছেন। উঠে বসবার শক্তিটুকুও বুঝি হারিয়ে গেছে।

—কি হয়েছে ঠাকুমা?—রোয়াকে বসে ভুবনমোহিনীর মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে গায়ে নিজের ঠাণ্ডা হাতটা রাখতেই চমকে উঠল শান্তি! একি গা যে বড্ড গরম? কাকীমাই বা

কোথায় গেল! কাকীমা—। বেশ জোরে ডাকল শান্তি।

ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন ভুবনমোহিনী—বৌমা বাড়ী নেই রে, একটু আগে কেষ্টনগর চলে গেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ রে! তার মার অসুখ। তা তুই মা একবার রান্নাঘরে যা—পরোটা কখানা বেলে রেখেছি আর ভাজতে পারি নি। এখুনি সতু চন্দ্র এসে খাই খাই করবে।

—সে হবেখন। আগে চল তোমাকে ঘরে শুইয়ে রেখে আসি। —আস্তে আস্তে ভুবনমোহিনীকে ধরে তুলল শান্তি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্তি পরিপাটি করে বিছানা করে ভুবনমোহিনীকে শুইয়ে রান্নাঘরে এসে দেখল সবকিছুই তৈরী—এমনকি আলুর তরকারীটা পর্যন্তও। কেবল পরোটা কখানা ভেজে নেওয়া। শান্তি চাটুটা উনুনে চাপিয়ে দিল।

তিন

চারটে বাজার কিছু পরেই সত্যজিৎ বইগুলো বগল দাবা করে বাড়ী ঢুকল। আলুথালু চুল, সুন্দর মুখখানা কেমন যেন শুকনো শুকনো; কাপড়টা হাঁটুর ওপর উঠেছে, গলাবন্ধ কোটের অর্ধেক বোতামগুলো খোলা। কিন্তু সেদিকে ওর খেয়াল নেই। বললেও শুনবে না, ঠিক করে দিলেও ঠিক রাখবে না। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে সত্যজিৎকে দেখে শান্তির মনটা ভিজে উঠল। ওকে নিয়েই তো ওর যত কিছু ভাবনা! এক মুহূর্তও যদি নিজের কথা ভাবতো দুষ্টুটা! তা কি ভাববে, তার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হৈ চৈ করে, নিজের খাবার পয়সাটা না খেয়ে দিয়ে আসবে। আজও বোধহয় পেটে কিছু পড়েনি। অথচ খাবারের পয়সার জন্যে মার সঙ্গে, ঠাকুমার সঙ্গে কি ঝগড়াই না করবে!

—ঠাকুমা খেতে দাও···বড্ড খিদে পেয়েছে। —বইগুলো বৈঠকখানার ঘরের চৌকিতে ফেলে রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঠাকুমাকে ডাকল।

—ঠাকুমার জ্বর হয়েছে। খাবার দিয়েছি খেয়ে যা।—শান্তি ভেতর থেকে বলল।

—কে, শান্তি নাকি? এখানে কি করা হচ্ছে শুনি? হাঁড়ি পাচ্ছিস্ নাকি রে?—রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে হেসে বললে সত্যজিৎ।

—ভীষণ মার খাবি সতে, বড্ড ফাজলামি শিখছিস্। আমি তোর চেয়ে কত বড় জানিস হনুমান? নে, নে বস এখন।

আসনে বসে খাবারের থালাটা কোলের কাছে টেনে একখানা পরোটার এক কোণ একটু ভেঙ্গে মুখটা বিকৃত করে বলল—এ কি পরোটা হয়েছে? কে করেছে—তুই বোধহয়! তা বাঁদরী আর এর চেয়ে ভালো কি তৈরী করবে? —এই বলে একটু তরকারী দিয়ে খানিকটা পরোটা হাসতে হাসতে মুখে তুললো সত্যজিৎ।

সত্যজিৎ আজ বেশ আনন্দে আছে। ওর মন ভালো থাকলেই শান্তির সঙ্গে খুনসুড়ি করার

নানান ফন্দী খুঁজতে থাকে। শান্তিরও ভালো লাগে, তাই প্রশ্রয় পায় সত্যজিৎ। বছর তিন-চারের ব্যবধান শান্তির সঙ্গে সত্যজিতের। কিন্তু শান্তির মনে হয় সত্যজিৎ যেন অনেক অনেক ছোট, ঠিক যেন পাঁচ বছরের এক ছেলে।

খেতে খেতে সত্যজিৎ হঠাৎ বলল—মাকে দেখছি না, কোথায় গেছে রে?

—তোর দিদিমার অসুখ তোর দাদা এসে নিয়ে গেছে।

—দাদা এসেছিল? কখন?

—আমি তো ঠিক জানি না, তিনটে নাগাদ হবে বোধহয়। আমি এসে দেখি ঠাকুমারও খুব জ্বর।

—ঠাকুমার খুব জ্বর এসেছে বুঝি?

—হ্যাঁ···হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর। আমি তো কিছু জানি নে, ঝি গিয়ে বলল—আমায় কর্তমা ডাকছেন। এসে দেখি রোয়াকে শুয়ে পড়েছেন।

—কি হবে! ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনব। —সত্যজিতের মুখখানা শুকিয়ে যায় হঠাৎ। খাবারের থালা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

—তোকে আর ভাবতে হবে না। লোকের অসুখ করলে থাকবি তো দূরে দূরে···একবার গিয়ে জিগ্‌গেসও করবি না কেমন আছে···থালি ঘুর ঘুর কররি আসে পাশে!

সত্যজিৎ ফ্যাল ফ্যাল করে শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন সে। রোগীর সামনাসামনি হয়ে আর সবার মত কুশল প্রশ্ন করতে পারেনা। তবু রোগীকে দেখে মায়া লাগে, কষ্ট নয়। মনে মনে তার সুস্থতা কামনা করে, উৎকণ্ঠাও হয় সব সময়। বারে বারে তাই একে ওকে রোগীর খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করে সত্যজিৎ। মায়ের অসুখের সময়, ছোড়দার অসুখের সময় ঠাকুমার আসেপাশে ঘুরেছে, দূর থেকেই দেখেছে কিন্তু কাছে যেতে পারে নি। এ কথা শান্তি নিজেও ভালো করে জানে। তার সামান্য জ্বরের সময় খেতে আসতো না এ বাড়ীতে। ও বাড়ীতে তার ঘরের আসেপাশে ঘুরে বেড়াতো। ভুবনমোহিনী জোর করে ধরে আনতেন খাবার সময়। তবু শান্তির সামনাসামনি হয়ে কথা বলতে পারে নি।

—কি হয় রে তোর? যাস্ না কেন? অসুখ কি বাঘ না ভালুক যে তোকে গিলে ফেলবে! অনেকে বলে সত্যজিৎকে একথা। কিন্তু ওর ম্লান হাসে কিছু বলে না। আর কিই বা বলবে? বলার মত কোন কিছুই নেই। নিজেও এ প্রশ্নের উত্তর পায় না মনের কাছ থেকে।

শান্তি কিন্তু বোঝে সত্যজিৎকে। ও জানে যদি কেউ বেশী সজাগ থাকে রোগীর সম্বন্ধে তবে সে সত্যজিৎ। এত দরদ যার মনে সে কখনও ইচ্ছে করে সরে থাকবে না। কষ্ট হয় ওর খুব, সেই-জন্যই ও পারে না কাছে যেতে।

সত্যজিৎকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে শান্তির বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে—তাই তো বেচারী হয়ত আর খেতে পারবে না।

—বসে রইলি কেন? খেয়ে নে লক্ষীটি!

সত্যজিৎ তবু চুপচাপ। তাকিয়ে থাকে শান্তির দিকে। চোখ দুটো যেন ছল ছল করছে।

সত্যজিতের কাছে সরে বসে ওর চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শান্তি বললে—তোকে ভাবতে হবে না। আমি তো আছি···লক্ষীটি খেয়ে নে, রাত্তিরে অনেক গল্প বলব। আমি তো থাকব এ বাড়ীতে।

একটা নির্ভরতার দীর্ঘশ্বাস ফেলল সত্যজিৎ। তারপর ম্লান হেসে বললে—খেতে যে আর ইচ্ছে করছে না শান্তিদি!

—ও কথা শুনছিনা। আমি খাইয়ে দিচ্ছি···খেতে হবে তোকে। —বেশ জোরের সঙ্গে বললে শান্তি।

—আমি কি ছোট ছেলে যে জোর করে খাওয়াবে?

—দেখ্ না। —এই বলে শান্তি জোর করে সত্যজিতের গলা জড়িয়ে তারপর এক টুকরো পরোটা তরকারি দিয়ে মুড়ে সত্যজিতের মুখের দিকে এগিয়ে দিতে যায়।

—খাচ্ছি বাবা নিজেই খাচ্ছি···তুই এত পাজি কেন বলতো শান্তিদি। ছাড়্না গলাটা!

—কেমন জব্দ! খেয়ে নে তবে! আমি উঠি। ঝিকে বলি কাজগুলো সব সারতে।

সত্যজিতের গলাটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শান্তি। সত্যি তো এ বাড়ীতে এখন অনেক কাজ —রাতের রান্নার ব্যবস্থা, ঠাকুর ঘরের কাজ, আরো কত কি খুঁটিনাটি।

চন্দ্রাবলীর স্কুলের গাড়ীটা ঠিক পাঁচটার সময় ওকে বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দিয়ে যায়। অন্য-দিনের মত চন্দ্রাবলী সোজা মায়ের ঘরে এসে মাকে খোঁজে। ওর জলখাবারের ব্যবস্থা মা-ই করে দেয়। যা ক্ষিদে পায় তখন···! দেরী হলে চোখে জল আসে, ঠোঁটটাও কেঁপে ওঠে। কথা বলতে রীতিমত কষ্ট হয়। মাকে ডাকল চন্দ্রা, কিন্তু সাড়া দিল না কেউ। বাড়ীটা যেন ফাঁকা। কি হোল, কোথায় গেল সবাই? নীচে ঝি-টাতো বেশ একমনে বাসন মাজছে! কিন্তু মা-ঠাকুমার সাড়া শব্দ নেই কেন?

আবার ডাকল চন্দ্রা—মা, ক্ষিদে পেয়েছে যে, খেতে দাও। নীচে নেমে এলো চন্দ্রাবলী।

সত্যজিৎ তখন রান্নাঘরের খাবারের সামনে বসে কি যেন ভাবছে। চন্দ্রার ডাকটা কানে যায়। চন্দ্রার ক্ষিদে পেয়েছে। ছোট বোন, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ওর সঙ্গে খুনসুড়ি করেছে—কিল চড়-চাপড়টা, চুলের বিনুনী টানা আর ভ্যাংচানো ছাড়া চন্দ্রার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক সত্যজিৎ ভাবতে পারে নি। কিন্তু আজ যেন ওর জন্যে মনটা কেমন করে উঠলো। চন্দ্রাকে কাছে বসিয়ে খাওয়াবার ইচ্ছাও জাগে। বেচারী সেই সকালে খেয়েছে।

আস্তে আস্তে সত্যজিৎ ডাকল—চন্দ্রা, রান্নাঘরে আয় খেয়ে যা।

ছোড়দা খেতে ডাকছে! মনের মধ্যে প্রচণ্ড এক ধাক্কা লাগে চন্দ্রাবলীর। কোনদিন তো ছোড়দা তাকে ডাকে নি নিজে থেকে! রান্নাঘরে নেমে এলো চন্দ্রাবলী।

এর মধ্যে সত্যজিৎ হাত ধুয়ে চন্দ্রার জন্য একটা থালায় পরিবেশন করে রেখেছে। চন্দ্রাবলীকে দেখে বলল—নে খেয়ে নে। মা কৃষ্ণনগর গেছে। দিদিমার অসুখ। নে, খেতে বসুনা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

চন্দ্রাবলীর মনটা ভিজে গেল। ছোড়দা এত ভাল! মেঝেয় বসে ও খাবারের থালাটা টেনে নিল।

—ঠাকুমার আবার জ্বর! —গম্ভীর হয়ে বললে সত্যজিৎ।

ছোড়দা এত ভাবে? এর আগে কোনদিন মনে হয়নি চন্দ্রাবলীর।

চন্দ্রাকে নিজের সামনে খেতে বসিয়ে আজ নতুন এক তৃপ্তির আস্বাদ পেল সত্যজিৎ। এর আগে কোনদিন যা পায়নি। চন্দ্রা যে তার ছোটবোন। ওকে হাসিখুসিতে ভরিয়ে রাখাই তার কর্তব্য আর তাতেই আনন্দ।

—আজ যেন বেরোসনি কোথাও। শান্তিদির সঙ্গে থেকে কাজকর্ম করিস, কেমন? —নরম স্বর সত্যজিতের।

চন্দ্রাবলী খেতে খেতে ঘাড় নাড়ল।

ঠিক এই সময়ে শান্তি এল রান্নাঘরে। একটু যেন থমকাল সত্যজিৎকে নির্মমভাবে চন্দ্রাবলীর সামনে বসে থাকতে দেখে। কিন্তু পরক্ষণেই মুচকি হেসে সত্যজিৎকে বললে—চন্দ্রার আজ মস্ত ভাগ্য বলতে হবে। স্বয়ং ছোড়দার তদারকে জলখাবার খাওয়া হচ্ছে।

মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল সত্যজিতের। লজ্জা—কিন্তু যেন ভাল লাগার ভাবও আছে। তাই ওর ঠোঁটের কোণে একটা মৃদু হাসির ঝিলিকের সঙ্গে প্রতিবাদও আসে—এই ভাল হচ্ছে না শান্তিদি।

—ভাল হচ্ছে না বললে আর কি হবে। হয়ে তো গেল কাজটা। যাক বাবা, আমারও একটা কাজ কমল। ঠাকুমাকে বলে আসিগে, তোমার নাতির এবার সুমতি হয়েছে, এবাড়ীর একটা নিত্যি ঝগড়া চুকে গেল—কি বলিস চন্দ্রা?

চন্দ্রা একটু যেন রাঙল। স্মিত হাসির সঙ্গে শান্তির দিকে চাহনিতেও একটু লজ্জার ছোঁয়া থাকে। কিন্তু কোন কথা বলে না চন্দ্রা।

শান্তিও খুসি হয়ে ওঠে। অনেক বুঝিয়ে অনেক বলেও এই দুটি ভাইবোনের মধ্যে মিষ্টি ভাব আনতে পারেনি ও। আজ হঠাৎই তা সফল হল। কাকাবাবুর কাছে কত মার খেয়েছে সত্যজিৎ চন্দ্রার সঙ্গে ঝগড়া আর মারামারি করার জন্যে। কেউ কাউকে দেখতে পারত না, একসঙ্গে খেতে বসতে চাইত না যারা, তারা আজ পরস্পরের প্রতি দরদী। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শান্তি। তারপর হেসে দুই ভাইবোনকে বললে—আজ কিন্তু আমার সঙ্গে দুজনকেই খাটতে হবে। চন্দ্রা তুই খেয়ে নিয়ে থালা ধুয়ে আয়, আর ছোটবাবু তুমি একটু ঠাকুমার কাছে বসগে, কেমন? বন্ধুবান্ধবকে কথা দেওয়া আছে নাকি?

সত্যজিৎ ঘাড় নেড়ে জানাল—না।

—তবে যাও দেখি, ঠাকুমার গা-হাত-পা একটু টিপে দাও গে। বসে এখন কিছু ভাবতে হবেনা।

—তুমি সব সময়ই দেখছ আমি ভাবছি। —গলার স্বর ভারী হয়ে আসে, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সত্যজিৎ।

শান্তি বুঝতে পারে ওর অসহায় ভাবটা। কবে যে ও মনের দিক দিয়ে সবল হবে কে জানে।

ক্রমশঃ

নোঙর

রবীন্দ্র সেনগুপ্ত

আমার এ কাহিনী অরুণা চৌধুরীকে নিয়ে।

আমি গল্প লিখি শুনে প্রথম আলাপেই অরুণা বলেছিল, আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে পারেন পরিমলবাবু?

আশ্চর্য হয়েছিলুম। গল্পের নায়িকা হতে সব মেয়েই চায় বটে, কিন্তু প্রথম আলাপেই সে ইচ্ছা প্রকাশ করা অভাবনীয়।

তারপর একটু লজ্জিত হাসি হেসে বলেছিল, আমার ফ্ল্যাটে আপনার একদিন নিমন্ত্রণ রইল। আসবেন। যেদিন সময় হবে।

অরুণাকে কথা দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে কথা রাখতে পারিনি। নানা কাজের ব্যস্ততায় তার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। আসল কথা, অরুণাকে দেখে এমন কিছু বিশিষ্ট মনে হয়নি। বরং তার রঙ-করা মুখ আমার মনে খানিকটা বিতৃষ্ণার ভারই এনেছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন অরুণাকে দূর থেকে দেখে কি জানি কেন আমার মনে হয়েছিল, তার মনে একটা কোন গভীর বেদনা আছে—বাইরের রূপটা তার খোলস মাত্র, ওটা আসল নয়।

সেই কথাই বলছি।

এস্‌প্ল্যানেড কফিহাউসে একটা চিংড়ির কাটলেট আর এক কাপ কফি নিয়ে বসেছিলুম। আমার সামনে বসেছিল, প্রায় আমারই সমবয়সী দুটি তরুণ। কথাবার্তা আর হাবভাবে মনে হচ্ছিল, একই অফিসের চাকুরে ওরা দুজনে। মাঝে মাঝে বেশ কৌতুক বোধ করছিলুম ওদের অসংযত মন্তব্যে। হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, ওদের দুজনেরই চোখের চঞ্চল দৃষ্টি কেমন যেন স্থির আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে না হলেও, ওদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফেরালুম। অরুণা—অরুণা চৌধুরী। প্রথম আলাপের পর আরও একবার দেখা হয়েছিল এবং সে যথারীতি তার ফ্লাটে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সেও সাময়িকের কথা। আজ ওকে দেখে মনে পড়ে গেল। ঠিকানাটা এখনও আমার কাছে আছে। —রাসেল ষ্ট্রীট। মুখ ফিরিয়ে—যাতে অরুণা আমাকে দেখতে না পায়—অভুক্ত কাটলেটটা কামড়াতে গিয়ে দেখি, সামনের ছেলেদুটি তখনও ঠিক তেমনি বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অরুণা আর তার সঙ্গী সুবেশ তরুণটির দিকে। এতক্ষণ ছেলেদুটির ব্যবহারে কৌতুক বোধ করছিলুম, কিন্তু এখন বিরক্তি এল। আমার চোখে-মুখে হয়ত মনের এই ভাবটা ফুটে উঠেছিল, কেন না প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, ছেলে দুটি আবার তাদের কফির পেয়ালায় মন দিয়েছে। কিন্তু বেশীক্ষণ তারা সেভাবে বসে থাকল না। একটি ছেলে হঠাৎ উঠে গেল সীট ছেড়ে। ফিরে এল

ছুটো সিগারেট নিয়ে। বন্ধুর দিকে একটা ঠেলে দিয়ে সে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে নিজের সিগারেটটা ধরালো, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে উঠল, বুঝলি বিমল, এবারের শিকারটা বেশ জবরদস্ত।

—কি করে বুঝলি? সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে অপর বন্ধুটি বলল।

—দেখলুম যে! গাড়ী করে এসেছে।

—তা, ওরই যে গাড়ী হবে তার কি মানে আছে।

—ওসব আমি বুঝি ভাই। আমার চোখকে সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। অপর বন্ধুটির দিকে নিজের জলন্ত সিগারেটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল সে।

চুপচাপ কাটল খানিকক্ষণ।

বিমল নামে ছেলেটি এবার প্রশ্ন করল, হ্যাঁরে অরবিন্দ, এটা নিয়ে কটা হল তোর খেয়াল আছে?

অরবিন্দ সিগারেট টানতে টানতে ওদের দেখছিল। বন্ধুর প্রশ্নে অন্যমনস্ক হয়ে বলল, এটা হল পঁচিশ নম্বরের।

—বলিস কি! এটা একেবারে সিল্‌ভার জুবিলি রে, য়্যাঁ!

অরবিন্দ এ উচ্ছ্বাসে সায় দিল না। তেমনি অন্যমনস্ক ভাবেই বন্ধুকে উদ্দেশ করে বলল, জানিস বিমল। এতবার দেখল ত, কিন্তু কিছুতেই রিকোগনাইস করল না। ভট্‌চাজ ঠিকই বলেছিল। আচ্ছা! আমাকে চেন না তুমি। অফিসময় যখন তোলপাড় করে দোব, তখন বুঝবে।

বিমল অল্প হাসতে হাসতে বলল, তাতে আর কি হবে? সেক্রেটারীর পেয়ারের স্টাফ্‌ ও। ওসবে কিছু করতে পারবি না। হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল বিমলের। আচ্ছা অরবিন্দ! একটা আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করে সে, আমাদের সেক্রেটারীর সঙ্গে কি সব যেন শুনছিলুম; জানিস না কি কিছু?

অরবিন্দ এবার তার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে পড়ল, তারপর বলল, সেসব চুকে বুকে গেছে। হিজ্‌ রেজিম ইস পাস্ট নাউ। সেক্রেটারী এখন ডিপোজ্‌ড্‌। শুনছি, তাই নাকি চেষ্টা চলেছে অরুণাকে অফিস থেকে তাড়াবার।

বিমল এবার যেন একটু জোরেই হেসে উঠল অবিশ্বাসের হাসি, তুইও যেমন! সেক্রেটারী তাড়াবে অরুণা চৌধুরীকে। যত সব রাবিশ আইডিয়াস! ও নিজেই একটা ফেমিনীন জেণ্ডার! ওর কোন ক্ষমতা আছে!

অরবিন্দ বাঁ চোখের ভুরুটা একটু নাচিয়ে বলল, ঠিক ধরেছিস! না হলে অরুণা কি আর সাতদিনেই বরখাস্ত করে। শব্দ করে হেসে উঠল দুজনেই।

হঠাৎ অরবিন্দ চমকে উঠল, এই ত্যাখ, ওরা চলে যাচ্ছে! কিছু খেল না ত মাইরি! বোধহয় কাউকে এক্সপেক্ট করছিল, বুঝলি? ওই দেখ ঘড়ি দেখছে! সিনেমা যাবে বোধহয়। ফলো করবো।

বিমল ছেলেটাও এবার বোবা চোখে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। অরবিন্দর প্রশ্নটা যেন তার

কানেই ঢোকে নি। এরপর মূর্ত্তি দুটো দরজার আড়ালে মিলিয়ে গেলে বিমল যেন স্বগতোক্তি করল, নাঃ! নিউ রিক্রুটটার রূপ আছে রে!

—রূপোও আছে। অরুণা চৌধুরী না হলে শুধু রূপে ভুলত না। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, সেটা ফেলে দিতে দিতে বলল অরবিন্দ।

একটু কৌতুক ভরেই এদের কথাবার্তা শুনছিলুম। অরবিন্দর শেষ কথাটি বেশ লাগল। ছেলেটি কথা বলতে জানে।

ওরা উঠে পড়ার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ কি মনে হল পকেট থেকে ক্যাপ্‌স্টেনের প্যাকেটটা বার করে ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, আসুন, ধরানো যাক্। তারপর ওদের প্রশ্ন করার কোন সুবিধে না দিয়েই বললুম, কিছু মনে করবেন না। মনে হচ্ছে, আপনারা এখনি যাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তিনি—

—তিনি একটি ফ্লার্ট। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করতে করতে বলল বিমল।

হেসে ফেলে বললুম, না। আমি বলতে চাইছিলুম, তিনি বোধহয় অনেক পুরুষেরই হার্ট-থ্‌র‌্‌স্। তাই একটু কৌতূহল বোধ করছি ওঁর সম্বন্ধে।

অরবিন্দ এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। সিগারেটও নেয় নি সে। তার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললুম, যদি আপত্তি না থাকে, তবে—শেষ করতে পারলুম না কথাটা।

অরবিন্দ সিগারেটটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে বলল—এক্স্‌কিউস্ মি। আপনার নামটা জানতে পারি? একটু দ্বিধা করলুম, তারপর হেসে বললুম, পরিমল ভাদুড়ী। কিন্তু কেন বলুন ত?

—মনে হচ্ছে, লেখেন-টেখেন?

—হ্যাঁ, অল্পস্বল্প। কেন, পড়েছেন কিছু আমার লেখা?

—বোধহয় পড়েছি এক আধটা। অরবিন্দ এবার বিমলের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিকই ধরেছিলুম। মানুষের মুখ চোখ দেখলে আজকাল আমি মানুষ চিনতে পারি। ভাবছি কেরাণীগিরি করে জীবনটা আর নষ্ট করব না।

অরবিন্দর কথার ধরণে আমরা উভয়েই হেসে উঠলুম। অরবিন্দ সে হাসিতে যোগ দিল না। সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি অরুণা চৌধুরী সম্বন্ধে জানতে চান, না? গুড্‌ চয়েস। সত্যি! সী ইজ এ সাবজেক্ট। —ফুল অফ ইভেন্টস! সামনে পুজো আসছে। লেগে পড়ুন ওকে নিয়ে, তারপর ছাড়ুন একটা তাকসই গল্প বাজারে। ফর্ ইনফরমেশ্যানস্ সেক্ আপনাকে অবশ্য কয়েকটা কথা জানাচ্ছি। বাকিটা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বা অন্য কোন সোর্স থেকে জেনে নেবার চেষ্টা করবেন। প্রথম নম্বর, তিনি আমাদের অফিসের টাইপিস্ট। দ্বিতীয় নম্বর, তাঁর স্বামী প্রায় বছর সাত হল নিখোঁজ। মানে বিদেশে গিয়েছিলেন পড়তে, তারপর আর ফেরেন নি। বোধহয় ওখানেই স্ত্রী জমিয়ে ঘর করছেন। তৃতীয় নম্বর হল, তাঁর অগণিত স্তাবক। প্রায় রোজই তিনি একটি করে নতুন বন্ধু জোটান। এস্‌প্ল্যানেড্‌ অঞ্চলে বোধহয় রোজই একবার করে তাঁকে দেখতে পাবেন। এরাই তাঁর নিত্য সাথী। সুতরাং এঁকে জানতে হলে আপনাকে আগে

ওদের ডিঙোতে হবে। নাহলেই বিপদের সম্ভাবনা।

—বিপদের সম্ভাবনা কেন? একটু মুচকি হেসে বললুম।

—মানে, আপনার ইন্টারভেনশন—

অরবিন্দ ইচ্ছে করেই কথাটা শেষ করল না। আমিও হাসতে হাসতে বললুম, বুঝেছি।

এই পর্যন্ত বলে চুপ করলুম।

—থামলে যে? সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো।

আমি বললুম, বাকীটা কাল শুনো। অনেক রাত হয়েছে। বাড়ী চলো। বৃষ্টি আজ আর থামবে না।

আমার কথা শুনে সবাই মারতে আসে আর কি।

অগত্যা আবার সুরু করলুম, ঠিক এমনই দুর্যোগের রাতে রাসেল ষ্ট্রীটের তিনতলার ফ্ল্যাটে অরুণা চৌধুরীর মুখোমুখি বসেছিলুম। ব্যবধান ছিল মাত্র একটা চারকোণা ছোট্ট টেবিল। রাত মোটেই বেশী হয়নি। কিন্তু অমন অবিশ্রান্ত বর্ষণে মনে হচ্ছিল রাত গভীর। জানলার দিকে মুখ করে তিনি বসেছিলেন। বৃষ্টির ছাটে ঘরের আসবাব, এমন কি তাঁর শাড়ীর প্রান্তভাগ জলে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠেছিল। একবার উঠে জানলাটা বন্ধ করতে গিয়েছিলুম, অরুণা বারণ করেছিল, বলেছিল, থাক্ পরিমলবাবু, বেশ লাগছে আমার। বৃষ্টির ঐ বেপরোয়া ভাবটা যেন আমার জীবনেরই উল্টোপিঠ। তারপরেই হেসে ফেলেছিল, ভয়ানক ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে। সত্যি, ঐ সব পোয়েটিক ফিলিস্‌গুলো আমি একেবারেই চেপে রাখতে পারি না। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। অথচ, আসলে আমি ভয়ানক ম্যাটার্-অফ্-ফ্যাক্ট ওম্যান। আমার কাহিনীও আমি সংক্ষেপেই বলব, তবু যদি—

অরুণা ঘাড়টি এলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে চাইল আমার দিকে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে হেসে বললুম, না, না, সমস্ত শুনব বলেই ত এসেছি। আপনি যেখান থেকে খুশী আরম্ভ করতে পারেন।

প্রথম প্রথম বেশ আন্তরিকতা নিয়েই অপেক্ষা করত অরুণা। বরং ভালই লাগত এমন অপেক্ষায়। কিন্তু সুর কেটে যেতে বেশি সময় লাগল না। প্রথম দিকে যাহক অন্তত দুমাসে, চারমাসে, একখানা করে চিঠি পেয়েছে। কিন্তু শেষ দিকে এমন হল দীর্ঘ একটা বছর কেটে গেল, কিন্তু চিঠি এল না। এর মধ্যে অরুণা কম করেও অন্তত পনেরোখানা চিঠি লিখেছে। শেষে হয়ত একখানা চিঠি এসেছে। কিন্তু তা এত ছোট্ট যে মন ভরে না। স্মরজিৎ প্রথম দিকে আদর করে লিখত, অরুণা এখানে এসে অব্দি তোমার অভাব বড় অনুভব করছি। কিছুই ভাল লাগছে না। অথচ ভাল লাগাবার কত আকর্ষণই না এখানে আছে। খুব চেষ্টা করছি তোমায় এখানে আনার। তুমি কিন্তু ইতিমধ্যে স্টেনোগ্রাফীটা শিখে নিও, এখানে এটার বেশ দাম। অরুণা সে চিঠি পড়ত, আর মনে মনে কল্পনার রঙীন জাল বুনত।

মাঝারি পরিবারের সামান্য আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে অরুণা; স্মরজিৎও অবশ্য খুব ধনী নয়। তাই বিয়েটাও তাদের সত্যকার বাঁধন হয়েছিল। কিন্তু স্মরজিৎ উচ্চাভিলাষী যুবক। একটা নামকরা ব্যাঙ্কে কাজ করতে করতে সুযোগ সুবিধে ঘটিয়ে সে হঠাৎ পাড়ি দিল বিদেশে—উদ্দেশ্য, চার্টার্ড হওয়া। যাবার সময় অরুণা কিছু বলতে পারে নি। কাঁদতেও পারে নি। কিন্তু মনে একটা বেদনা বোধ করেছিল। বোধে অব্দি এগিয়ে দিতে গিয়েছিল অরুণা। জাহাজ ছাড়ার আগের দিন স্মরজিৎ গভীর প্রেমে অরুণাকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিল। অরুণার একটু স্থূল দেহটা শক্ত হাতে বেঁধে বলেছিল, কিছু ভেব না অরুণা। মাত্র পাঁচ বছরের কোর্স আমার। দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। তারপর যদি এ্যাপয়ন্টমেন্ট ওখানে পাই, তাহলে ত—

স্মরজিৎ শেষ করে নি। শুধু আলিঙ্গন আরও নিবিড়, আরও গাঢ় করেছিল। আর সে আলিঙ্গনের মাঝে পড়ে অরুণা শুধু কেঁপেছিল থর থর করে।

এরপর প্রথম চিঠি আসে ঠিক মাস ছয়েকের মধ্যেই। নীল খামে। আপাদমস্তক নানা রঙের ডাকটিকিটে সজ্জিত হয়ে অরুণার হাতে এসে পৌঁছল চিঠিটা। প্রথমে একটু শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল সে। খুলতে সাহস হয় নি। বুকের কাছে অনেকক্ষণ চেপে ধরে একটা পরিচিত নিঃশ্বাসের পীড়ন অনুভবের চেষ্টা করেছিল। বেশ দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল স্মরজিৎ। অনেক কথা, অনেক গল্প, অনেক ঐতিহাসিক তথ্যে ভরা ছিল সে চিঠি। সমস্ত খুঁটিনাটি ঘটনা যা তার চোখকে প্রথম দর্শনে মুগ্ধ করেছিল, তারই বিবরণে ভরা ছিল সে চিঠি। শেষ স্তম্ভে স্মরজিৎ লিখেছিল, অরুণার যদি আপত্তি না থাকে তবে সে যেন তৈরী হয়ে নেয়। শিগ্‌গিরই তাকে আনার ব্যবস্থা করবে সে। তবে এর মধ্যে অরুণা যেন স্টেনোগ্রাফীটা শিখে রাখার ব্যবস্থা করে। চিঠিখানা পড়ে আহ্লাদে হাততালি দিয়ে উঠেছিল অরুণা। বিলেত! উঃ! কি সুন্দর! কেমন তার লোকগুলো! সত্যি! স্বামী-ভাগ্য তার হিংসে করার মতই! বাংলাদেশের কটা মেয়েই বা বিলেত দেখার সুবিধে পায়! অরুণার দাদা হাসতে হাসতে বলেছিলেন—ইস্! অরুণার মুখে আজকাল হাসি আর ধরে না দেখছি! তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে অরুণার বৌদির দিকে চেয়ে বলেছিলেন, নাঃ! অরুণা সত্যিই ভাগ্যবতী। যাক্ আমাদের কপালে ত আর হল না। ঘুরে আসুক ও, তারপর বুড়ুক দুটো দেশে তফাৎ কতখানি।

এমন একটা লোভনীয় খবর চাপা রইল না। অরুণা কটা দিন বাদেই উত্তর দিল স্মরজিৎকে। অনেক কথা লিখল সে। দাদা তাকে জর্জ টেলিগ্রাফে ভর্তি করে দিয়েছেন। তারা বলেছে ছমাসের মধ্যেই ভাল স্পীড্ করিয়ে দেবে। সুতরাং স্মরজিৎ যেন তার যাবার ব্যবস্থা আরম্ভ করে দেয়। এ চিঠির উত্তর এল দীর্ঘ ছমাস পরে। তাও মাত্র কটা অপ্রয়োজনীয় কথায় ভর্তি হয়ে। স্মরজিৎ অনুরোধ করেছে তার দাদাকে, যেন তিনি নিজে ল্যায়ড্‌স্ ব্যাঙ্কে গিয়ে তার দরখাস্তটার একটু তদ্বিরের ব্যবস্থা করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সেচিঠিতে অরুণার নামোল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। আহত হল অরুণা, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু জানাল না কাউকে। চিঠির উত্তরও দাদার বদলে সেই লিখল। লিখল সোজাসুজি। ভণিতা করল না—বাজে কথায় চিঠির কলেবরও বাড়াল না। শুধু মিনতি জানাল তার যাওয়ার ব্যাপারটায়। উত্তর কিন্তু পেল না অরুণা। মাস, বছর ঘুরে গেল, উৎকণ্ঠিত

প্রতীক্ষায় সে ছটফট্ করতে লাগল, কিন্তু এয়ার-মেলের খাম স্বরজিতের কোন বান্ধবই বহন করে আনল না তার কাছে।

ইতিমধ্যে অরুণা সদাগরী অফিসে সাময়িক ভাবে একটা চাকরি নিয়েছে। টাইপিস্টের চাকরী। ভাল লাগে না তার। তবুও লেগে থাকতে হয়। যদি কিছু জমাতে পারে এই আশায়। আরও কটা চিঠি লিখেছে সে। কিন্তু উত্তর পায়নি। ইদানিং একটু বিরক্ত হয়েই চিঠি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে সে। দাদা তিরস্কার করেছেন। বৌদি সস্নেহ অনুরোধ করেছেন। কিন্তু অরুণা মোটেই রাজি হয় নি চিঠি লিখতে। তার কেমন যেন মনে হয়েছে, সুর কোথায় কেটে গেছে।

সেদিন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অরুণা দাঁড়িয়েছিল জি-পি-ওর বাড়ির সামনে। আকাশ মেঘে থমথম করছে। অরুণার মুখটাও ভারি। একটা চিঠি পেয়েছে স্বরজিতের। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা লেখার পর চেয়ে পাঠিয়েছে হাজারখানেক টাকা। অরুণার কাছে যদি তা না থাকে, তবে সে যেন তার শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া গয়নাগুলো বাঁধা দিয়েও এ টাকা জোগাড় করে। বিদেশে সে ষ্ট্রানডেড্ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় সম্মান রক্ষার ঝুঁকি স্ত্রী হিসেবে তারও ভাগ করে নেওয়া উচিত। তবে স্বামীর কর্তব্য সম্বন্ধেও সে উদাসীন নয়। ল্যায়ড্ সে একটা মোটা অঙ্কের চাকরি নিয়ে শিগ্‌গিরই সে কলকাতায় ফিরবে, আর তখন সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে। চিঠিটা পড়ে অরুণার সমস্ত সত্তা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। উঃ! কি অদ্ভুত সাহস স্বরজিতের! কেমন অনায়াসে লিখতে পারল এ কথাগুলো! স্পষ্ট খোঁচা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, গয়নাগুলোয় অধিকার তার চেয়ে স্বরজিতের নাকি বেশি। অফিসের সময় তাড়াতাড়িতে চিঠিটা ব্যাগে পুরে এনেছে সে। অফিসে বসেও কবার পড়েছে সে চিঠিটা। কিছু বুঝতে পারে নি, কি তার কর্তব্য। দাদাকেও দেখানো হয় নি চিঠিটা। দেখাবে কিনা তাও বুঝতে পারছে না সে। বেশ ঠাণ্ডা হওয়া বইছিল রাস্তায়। বৃষ্টি আসতে পারে। অরুণা ক্লান্তিতে অবশ। কোনরকমে হাত দিয়ে মুখের ওপর পড়া চুলগুলো সরাতে সরাতে ভাবছিল কি করা যায়।

ডালহাউসী অঞ্চল এ সময়টায় কেরাণীদের সশব্দ আর্তনাদে আতঙ্কিত থাকে। মুহূর্ত বিলম্বও কেউ সইতে রাজি নয়। একই যানে সবাই ঘরে ফিরতে চায়। অদ্ভুত আবদার! অরুণা তাই দাঁড়িয়েছিল। বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলেও সে অপেক্ষা করছিল একটা অপেক্ষাকৃত খালি বাসের। রাস্তাঘাট যেন নানা জাতের মানুষ আর নানা যানে একাকার হয়ে গেছে। হঠাৎ তার মনে হল, একটু দূরে থেকে একজন ভদ্রলোক যেন বিশেষ ভাবে তাকেই লক্ষ্য করছেন। আড়চোখে চেয়ে অরুণার সন্দেহ দূর হল। কিন্তু কি করা যায় এখন! অমানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। ভদ্রলোকটি এবার এগিয়ে এলেন তার দিকে, তারপর নমস্কার করে বিনীত ভঙ্গীতে বললেন, কিছু যদি মনে না করেন ত একটা কথা বলি। অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি। অথচ ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি, কিন্তু—

অরুণা স্পষ্টই চিনতে পেরেছিল লোকটিকে। স্বরজিতের বন্ধু—নরেন ঘোষাল। বিয়ের পরও এসেছে কয়েকবার। তারপরই আস্যা বন্ধ করে দিয়েছিল, কেন কে জানে। অরুণার বেশ মনে

পড়ে, বৌভাতের রাত্তিরে নরেন পর পর সাতখানা গান শুনিয়েছিল তাকে।

নরেন ঘোষালকে তাই মাঝপথে থামিয়ে অরুণা বলল, আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনার নাম্ নরেন ঘোষাল, না? আমায় একেবারেই চিনতে পারলেন না? মনে নেই, সেই সাতখানা গান শোনানোর কথা?

নরেন ঘোষালের মুখটা চকিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চশমার আড়ালে চোখদুটো চিক চিক করে উঠল, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল আই সী! আপনি তাহলে স্বরজিতের স্ত্রী, না? দেখুন দিকি কিরকম ভুলে গিয়েছিলুম। মানে, কনট্যাক্ট না থাকলে যা হয় আর কি। অথচ কটা বছর বা। তারপর, স্বরজিতের খবর কি?

—উনি ত এখানে নেই। ইউ, কে, গেছেন চার্টার্ড হতে।

—ইউ, কে? সেখানে কেন আবার। শুনেছি এখান থেকেও চার্টার্ড হওয়া যায়। না, না ঠিক হয়নি। তারপর হঠাৎ অরুণার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে নরেন ঘোষাল বলে উঠল, মিসেস চৌধুরী, আপনার চেহারার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আপনি ভয়ানক ক্লান্ত। কোন অফিসে কাজ নিয়েছেন, না?

মুখটিপে একটু হাসল অরুণা, কি করে বুঝলেন? সত্যিই ভয়ানক টায়ার্ড ফিল করছি।

নরেন ঘোষালের ছোট্ট সরু মুখটা একটা অব্যক্ত বেদনায় থমথমে হল, বুঝতে আমরা ঠিকই পারি মিসেস চৌধুরী। অফিস ছাড়া এমন রক্তশোষা যন্ত্র আর কি আছে বলতে পারেন? যাক্, অফিসে যখন ঢুকেছেন, তখন দুদিনেই সব বুঝতে পারবেন। উপস্থিত যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে একটা প্রপোজাল দিতে পারি। বাই দি বাই, আপনার এ সময় বিশেষ কোন এ্যাপয়ন্টমেণ্ট নেই তো?

—না না তেমন কিছু নেই। কিন্তু প্রপোজ্যালটা কিসের বুঝলাম না ত?

—ও এমনিই। আসলে এই সময়টায় আমি রোজই এককাপ করে কফি খেয়ে থাকি। তাই বলছিলুম আপনাকে, যদি আপত্তি না থাকে, আপনিও আসতে পারেন। এক কাপ কফি আপনাকে অনেকখানি এনার্জি দেবে।

একটু চুপ করে থেকে নরেন ঘোষাল আবার বলল, স্বরজিৎ কবে ফিরবে জানেন কিছু?

—বছরখানেকের ওপর ত হয়েই গেল। আরও বোধহয় বছর তিন লাগবে।

—ওঃ, তাহলে এই কটা বছর চাকরিটা আপনাকে চালিয়েই যেতে হচ্ছে। কি বলেন? একটা তির্যক হাসির সঙ্গে কথাগুলো বলল নরেন।

এরপর থেকে অরুণাকে প্রায়ই দেখা যেতে লাগল নরেন ঘোষালের সঙ্গে। কখনও কফি হাউসে, কখনো রেস্তোরাঁয়, কখনও চৌরঙ্গীর মোড়ে। আবার কখনও বা সিনেমায়। অফিসের পর এক একটা যায়গায় মিলত তারা। অরুণাও যেন বেঁচে গিয়েছিল নরেন ঘোষালকে পেয়ে। মনের এমন ক্লান্ত, অবসন্ন অবস্থায় এমন একজন বন্ধুর খুব প্রয়োজন ছিল তার। নরেন ঘোষালকে বিশ্বাস করতে পেরেছিল অরুণা। অকপট হয়েছিল তার কাছে। তাই অরুণা-স্বরজিৎ-উপাখ্যানের

সবটুকু জানা হয়ে গেল নরেন ঘোষালের। তারই পরামর্শ মত অরুণা অরজিৎকে চিঠি দেওয়া বন্ধ করল—টাকাও পাঠাল না সে।

অরুণা একদিন হাসতে হাসতে বলল, নরেন। এবার কিন্তু কথা উঠছে। একটু সাবধান হবে না কি?

ভবানীপুর ক্লাবের মাঠে বসেছিল ওরা দুজন। নরেন ঘোষালের হাতে একটা সিগারেট। একটা টান দিয়ে নরেন বলল, আমিত ঐরকমই কিছু আশা করছিলুম। তোমার দাদা কি বলেন?

—দাদা। কিছুই বলেন না তিনি। যা বলার বৌদিই বলছেন। দাদা আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন। ভাবছি, ওখান থেকে চলে আসব।

—কোথায়? নরেনের স্বরে ব্যগ্রতা।

একটু চুপ করে অরুণা বলল, কোন একটা ফ্ল্যাটে। আছে নাকি জানাশোনা?

নরেন ঘোষালের সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সেটাতে একটা টান দিয়ে সে দূরে ছুঁড়ে দিল। তারপর রুমাল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বলল, একটা কথা ভাবছিলুম অরুণা। তোমার অনুমতি পেলে বলি।

শব্দ করে একটু হাসল অরুণা, আমার অনুমতি! আচ্ছা বল, কি বলার আছে।

নরেন ঘোষাল একটু ইতস্তত করল, তারপর স্থির গলায় বলল, তোমায় যদি বিয়ে করি, আপত্তি আছে তোমার?

একটু থমকে গেল অরুণা, তারপর মুখ নীচু করে বলল, আছে বৈ কি। ভুলে যেও না, তোমার বন্ধুর ফিরে আসার সময় এখনো যায় নি।

—কে, অরজিৎ? আশ্চর্য! তুমি এখনো তার অপেক্ষায় বসে আছ নাকি?

অরুণা এবার স্পষ্ট তাকাল নরেন ঘোষালের দিকে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হল না তার মুখটা। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিল অরুণা, তারপর স্থির গলায় বলল, নরেন, তোমার বন্ধু আবার বিয়ে করেছে। গতকাল সে চিঠি পেয়েছি। সুতরাং তার জন্য অপেক্ষা করা আর সম্ভব নয়।

—তাহলে? নরেন ঘোষাল আবার ব্যগ্র হয়ে ওঠে। ব্যস্তভাবে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সে ঠোঁটে রাখে।

অরুণা চুপ করে থাকে। এরপর আর সে ভাবে নি। অরুণার জীবন কেমন করে চলবে, তাও সে জানে না। নরেনের মুখটা অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। কিন্তু অরুণা জানে, তাকে বিশ্বাস করা চলে। হঠাৎ অরুণা উঠল; শাড়ির আঁচলটা ঠিক করতে করতে বলল, চল নরেন, একটু ক্লাব থেকে ঘুরে আসা যাক্।

নরেন উঠল। কোন ব্যস্ততা নেই, কোনো আবেগ নেই। অরুণার সঙ্গে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। একটু পরে সে আবার প্রশ্ন করল, কি ঠিক করলে?

অরুণা এতক্ষণে মনটা গুছিয়ে নিয়েছে। নরেনের হাতটা ধরে একটু চাপ দিয়ে বলল, ভুল বুঝ না নরেন। তোমায় বিয়ে করতে পারলে খুশী হতুম। কিন্তু মনে কেমন যেন জোর পাচ্ছি না।

ভাবছি, মুক্তি যখন পেয়েই গেছি এত সহজে, তখন আর নতুন করে নিজেকে জড়িয়ে কি লাভ।

নরেন ঘোষাল সামান্য একটু হাসল অরুণার কথা শুনে। কথা বলতে বলতে তারা ট্রাম-টারমিনাসের কাছ বরাবর এসে গিয়েছিল। একটা খালি শ্যামবাজারের ট্রাম আসছিল, সেটা দেখিয়ে নরেন বলল, আজ চলি অরুণা, যান হাজির। কাল যদি সম্ভব হয়, দেখা করব তোমার অফিসে।

হাতটা ধরা ছিল অরুণার হাতে। ছাড়াতে গেল নরেন। একটা নরম উষ্ণ স্পর্শে শিরশির করে উঠল নরেনের শিরাগুলো। সোজাসুজি সে তাকাল অরুণার দিকে। একটা মুহূর্ত মাত্র। অরুণা তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে সহজ হবার ভঙ্গীতে বলল, তুমি তাহলে ক্লাবে আসছ না। আমায় একবার যেতেই হবে, অপূর্বকে কথা দিয়ে এসেছি।

নরেন ঘোষাল কোন কথা বলল না। শুধু আর একবার অরুণার দিকে চেয়ে খালি ট্রামটায় উঠে পড়ল। অরুণা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

অরুণা চুপ করল। গল্প বলার ক্লান্তিতে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। একটা তোয়ালে দিয়ে মুখটা ঘষতে ঘষতে সে একটু হাসল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এরপর আর কিছু বলার নেই পরিমলবাবু। নিতান্তই গতানুগতিক ঘটনা। দাদার বাড়ি ছাড়লুম। এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিলুম। নরেন ঘোষাল হয়ত চলে গেল, কিন্তু পুরুষ বন্ধু কত এল কত গেল তার আর ইয়ত্তা নেই। কেউই কিন্তু টিকল না।

এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলুম অরুণার কথা। এবার একটা প্রশ্ন না করে থাকতে পারলুম না, নরেনবাবুর সঙ্গে আর দৈখা হয় নি আপনার?

অরুণা একটুও চিন্তা করল না, সরাসরি বলল, না আর দেখা হয় নি। ভালই হয়েছে। না হলে হয়ত অমন উদ্দাম জীবন যাপনে বাধা আসত। সে একটা অদ্ভুত সময়। কোন সংকোচ, কোন জড়তা আসে নি সে জীবনে। মনে হয়েছে—

অরুণা হঠাৎ চুপ করে গেল। সহজ দৃষ্টি মেলে ধরল সামনের দিকে। হয়ত মনে পড়ে গেল সেই সব সহজ দিনগুলোর কথা। একটা নিঃশ্বাসও হয়ত পড়ল—কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম না।

অরুণা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। পরিবেশটা অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। একটা কিছু বলা দরকার, কিন্তু কি বলব। কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল অরুণাকে। চোখের দৃষ্টি একটু যেন বিধুর, বিষণ্ণ। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল সে। একটু যেন আত্মগত ভাব।

সবই শোনা হয়ে গিয়েছিল।

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলুম, সিঁড়িতে মচ্ মচ্ জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। একটা ক্লান্ত ভারি পদক্ষেপ।

অরুণা হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কান খাড়া করে কি যেন শুনবার চেষ্টা করল। ইতিমধ্যে আবির্ভাব হল তৃতীয় ব্যক্তির। মাথায় ছোটখাট; বলিষ্ঠ চেহারা আগন্তুকের।

চুল ছোট করে ছাঁটা। মুখের গড়ন একটু যেন চৌকো ধরণের। চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী। দাড়ি গোঁফ সুন্দর করে কামানো। পরণে খাঁকি কর্ডের ট্রাউজার, গায়ে সাদা সিল্ক টুইল সার্ট, গলায় লাগানো টাই, হাতে ঝোলানো পোর্টফোলিও ব্যাগ। মুখে চোখে কিন্তু কেমন যেন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। অরুণা আগন্তুককে দেখেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমার অস্তিত্বই যেন ভুলে গেল সে। তাড়াতাড়ি লোকটিকে একটা খালি সোফায় বসিয়ে, গলার ফাঁস আল্‌গা করে, তারপর নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে হাতের পোর্টফোলিও ব্যাগটা তুলে রাখল সে সামনের তেপায়া ছোট্ট টেবিলটায়। আগন্তুক সোফায় এলিয়ে বসে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন, তারপর হঠাৎ যেন আমায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন এমনিভাবে আমার দিকে চেয়ে অরুণাকে প্রশ্ন করলেন, ইনি ?

জুতোর ফিতে খোলা হয়ে গিয়েছিল অরুণার। পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলে ভেতরের কাগজ-পত্রগুলো বোধহয় সাজিয়ে রাখছিল। আগন্তুকের প্রশ্নে একটু চুপ করে, আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, কি আশ্চর্য! পরিমলবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়েই দেওয়া হয়নি যে! ওঁর নাম পরিমল ভাদুড়ী। লেখেন টেখেন। আর পরিমলবাবু, ইনি আমার স্বামী এস, চৌধুরী সি, এ।

ভদ্রলোকটি জোর করে মুখে হাসি টেনে নমস্কার করার ভঙ্গীতে হাত দুটো জড়ো করলেন আমার দিকে চেয়ে।

অরুণার কথায় সামান্য ভদ্রতাবোধটুকুও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছিলুম। নাহলে ভদ্রলোকটিকে অন্তত প্রতিনমস্কারটাও জানাতুম। স্পষ্ট করে তাকালুম অরুণার দিকে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল সে, বোঝা গেল না তার মুখের অবস্থাটা। চেয়ে রইলুম সেদিকে, তারপর কেমন যেন চমকে উঠে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে এলুম ঘর থেকে।

সমস্ত ঘটনাটাই কেমন যেন মনে হচ্ছিল। মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে গিয়েছিল। তাই রাস্তায় নেমেও মোহগ্রস্তের মত হাঁটতে সুরু করলুম। কয়েক পা হয়ত গেছি, পেছনে শুনলুম কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, পোর্টিকোর তলায় দাঁড়িয়ে অরুণা হাতছানি দিয়ে ডাকছে। একটা থামের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল দেহটা, তাই আলোছায়ায় মূর্ত্তিটা মনে হচ্ছিল রহস্যঘন। আমি দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করলুম, তারপর সোজা অরুণার সামনে এসে দাঁড়ালুম।

অরুণাও ইতস্তত করল না। সহজ ভাবে আমার হাত দুটো ধরে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আমার ওপর হয়ত খুব রাগ করে যাচ্ছেন। আমিও বুঝেছিলুম সে কথা। কিন্তু এ ছাড়া আমার আর অন্য উপায় ছিলনা। ওঁর সামনে স্ত্রী ভিন্ন আর অন্য কোন পরিচয়ই আমার নেই। বলা বাহুল্য, উনিই আমার স্বামী, ওঁরই নাম স্বরজিৎ চৌধুরী, কিন্তু সি, এ, নন্। চার্টার্ড পরীক্ষা দেওয়ার আগেই আমারই মত কোন সর্বনাশীর হাতে হয়ত পড়েছিলেন। তারপর আমার হাতে অপূর্ব, নিশীথের যে অবস্থা হয়েছিল, ওঁরও ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছিল। অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে বিদেশে গিয়ে-ছিলেন। সেসব খুইয়ে আবার যখন দেশের মাটিতে পা দিলেন, তখন দেখলেন শেষ সম্বল মগজটিও

গেছে। দেশে ফিরলেন বেদম পাগল হয়ে। বছর দুই আগে ঠিক ওই অবস্থাতেই ওঁকে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিলুম কলকাতার রাস্তায়। চিনতে ভুল হয়নি। জানেন ত, মেয়েরা একবার যাকে ভাল করে দেখে তাকে আর সারা জীবনে ভোলে না! বাড়িতে আনলুম ওঁকে। তারপর চিকিৎসা সেবা আর যত্নে অনেকটা স্বাভাবিকও হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু যতই স্বাভাবিক হতে থাকলেন, ততই যেন আমায় আঁকড়ে ধরতে সুরু করলেন। উনি ছাড়া অপর কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই সন্দিগ্ধ হতে লাগলেন। প্রথম প্রথম বিরক্ত হয়ে উঠতুম, কিন্তু পরে বুঝলুম এটাও ওঁর একধরণের পাগলামি। তাই যতক্ষণ উনি বাড়িতে থাকতেন, ততক্ষণ অভিনয় করতে হত। সুবিধেও ছিল প্রচুর। চার্টার্ড না হলেও, রোজ ঠিক দশটার সময় পোষাক পরে উনি বাইরে বেরিয়ে যান—যেন নিজের ফার্মে যাচ্ছেন। ফেরেন সেই সন্ধ্যার পর। তাই অভিনয়ের সময়টুকুও হয় অল্প, বিশেষ অসুবিধা হয় না।

অরুণা থামল।

বৃষ্টি অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু রাস্তা তখনও ভিজে রয়েছে। ভিজে রাস্তায় আলো পড়ে চিকচিক করছে। অরুণা মুখ নীচু করে সেইদিকে চেয়ে রইল। আর সেই আনত-দৃষ্টি অরুণার দিকে তাকিয়ে আমার শুধু একটা কথাই মনে হল—মনে হল, স্বরজিৎ দুর্ভাগা নয়।

গ্রন্থপরিচয়

বসন্তবাহার : গোপাল ভৌমিক। গ্রন্থ-জগৎ। দেড় টাকা।

'বসন্তবাহার' শ্রীগোপাল ভৌমিকের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'স্বাক্ষরে' যে স্বর ছিল কুণ্ঠিত, দ্বিধাজড়িত, এখানে তার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। 'বসন্তবাহারে'র কবিতাগুলোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে কোন চেষ্টাকৃত প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না; পরন্তু সহজ, সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার জন্যে তা সরাসরি পাঠকসাধারণের মনকে নাড়া দিতে পারে। আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা শ্রীভৌমিকের রচনায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, রাজনীতির তির্যক দৃষ্টি তাঁর নয়, সমকাল-চেতনার আতিশয্য নেই, ছন্দ নিয়ে দুরূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষপাতীও তিনি নন। শ্রীভৌমিকের কবিতায় মননশীলতার অকারণ চর্চা নেই বলেই তার আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে। যদিও তাঁর কবিতা আবেগনির্ভর তবু কবি বলছেন :

আবেগের মাটির প্রলেপ
মন থেকে খসে যদি
খসে যাক্—
করিনা আক্ষেপ :
বুদ্ধির ইস্পাত যদি
ঝকমক্ করে সারাক্ষণ
ক্ষতি নাই—
যাক্ পুড়ে ঘুণ-ধরা এ মন।

কারণ তিনি মনে করেন আবেগ মুহূর্তের বিলাস মাত্র।

আজ বিংশ শতকের শেষার্দ্ধে মানুষের জীবনধারা বদলে গেছে। বাঙালীজীবনও তার থেকে বাদ পড়েনি। কিন্তু বাঙালীমন মূলত গ্রামীণ; জীবিকার প্রয়োজনে নগরে বাস করলেও তারা নগরজীবনকে বরদাস্ত করতে পারে না। অবসর মুহূর্তে তাদের মন ছুটে যায় গ্রামের সবুজ পটভূমিতে আর নগরের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব জেগে ওঠে। কবি-সাহিত্যিকরাও এই মানসিকতা থেকে মুক্ত নন। তাই বাংলা সাহিত্যে এখনও গ্রামেরই জয়জয়কার। অক্টোপাসের মত নগর যেন আমাদের জীবনকে চারদিক থেকে চেপে ধরেছে, যন্ত্রদানব আমাদের রক্ত শুষে খাচ্ছে, এর থেকে মুক্তি চাই—এমন মনোভাব সমকালীন বাংলা কাব্যে অতি-প্রকট।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায়ই নাগরিক জীবনের হতাশ্বাস সোচ্চারিত। জীবিকার দেনা শোধ করতে মানুষের স্বপ্ন ঝরে যাচ্ছে। মুক্তি নেই নগরজীবনের গ্লানি থেকে।

তাই কবি চান দৈহিক মিলনের পথে কামনা মেটাতে। তখন মনে হয়, 'জীবনের, যৌবনের এই শেষ কথা' যদিও জানেন, 'তারপর ব্যবধান, অবসাদ, ঘৃণা আর ঘৃণা'। তবু,

পরম প্রাপ্তির ক্ষণে চরম এ জীবনের ঋণ—
শোধ করে দিয়ে যাই
আনন্দের তীব্র হলাহলে—
স্মৃতি থাক্ রাত্রির অঞ্চলে।

কিন্তু সবই ভুল :

...অক্ষম আমি
শক্তি নেই সাড়া দেব,
অনুভূতি হাওয়ায় মিলালো।

'তুমি', 'সময়', 'অশেষ,' 'বসন্তবাহার'—এগুলো স্বচ্ছ ভাবনার কবিতা এবং রসোত্তীর্ণও বটে।

নববর্ষ : বাংলা বার্ষিকী, ১৩৬২। সম্পাদক : শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। দুই টাকা।

সমকালীন সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় একমাত্র সঙ্কলনের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাংলা দেশে সাহিত্যসঙ্কলনের তেমন চল নেই। পূর্বে দু-একটি সঙ্কলন যা নিয়মিত প্রকাশিত হত সবই শেষ পর্যন্ত বন্ধ গেছে। কিন্তু আলোচ্য বার্ষিকী 'নববর্ষে'র ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। সম্প্রতি এর তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, রাণী রায়, নরেন্দ্র দেব, গোপাল ভৌমিকের প্রবন্ধ; রাধারাণী দেবী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, রাণা বসু, আর্যপুত্র সুপ্রিয়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা; দক্ষিণারঞ্জন বসু, সরোজকুমার রায়চৌধুরীর গল্প এবং প্রাণতোষ ঘটকের উপন্যাস এই সংখ্যার উল্লেখনীয় রচনা।

টেস অফ দি ডারবারহিলস : টমাস হার্ডি। প্রথম পর্ব : কুমারী। দ্বিতীয় পর্ব : কলঙ্কিতা। অনুবাদ : শ্যামসুন্দর মাইতি ও শোভনা মাইতি। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। তিন টাকা।

টমাস হার্ডির বিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি ও শ্রীশোভনা মাইতি। একেবারে স্বচ্ছন্দ, সুষ্ঠু ও যথাযথ অনুবাদ না হলেও পড়ে মোটামুটি মূলের আস্বাদ পাওয়া যায়; অনুবাদকদ্বয় অনুবাদে হার্ডির রচনাগুণ অন্তত আংশিকভাবেও উপস্থিত করতে পেরেছেন। আশা রাখি এঁদের হাতে বাংলা সাহিত্যের এই শাখাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

হীরেন বসু

বলা হয়ে থাকে, মানুষ মূলত সামাজিক জীব। আদিম যুগে মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে বাস করত, সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, তখন থেকেই মানবসমাজের উদ্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য, তৎকালীন সমাজের রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যৌথভাবে বাস করতে গেলে যে ব্যক্তিকে মানিয়ে চলতে হয় এবং সামাজিক রীতিনীতির অধীনতা স্বীকার করতে হয়, এ মনোভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে সমাজ-বিবর্তনের পথে।

সমাজ একটা জড়পদার্থ নয়। সমাজ সচল—কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজেরও বদল হয়। কিন্তু ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। তাই ব্যক্তিকে বলি দিয়ে সমাজ চলতে পারে না। সমাজ ষ্টাটিক্ হলেই ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়।

আবার ব্যক্তিকেও কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া, ব্যক্তিকে সবসময় এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, সে যেন তার আচার-আচরণের দ্বারা সমষ্টির অকল্যাণের পথ প্রশস্ত না করে।

রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার ফলে সমাজের রূপ অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তির মানসিকতাও আজ দ্বিধা-বিভক্ত। যে মানুষ নিজের পরিবারের মধ্যে সৎ, মহৎ, সেই একই মানুষ সমষ্টির প্রান্তরে সমস্ত মহত্ত্ব ঘুইয়ে বসে। একদিকে অবাধ স্বার্থপরতা আর একদিকে সমষ্টির জন্য যথোচিত আচরণ—কোনটা মানুষ বেছে নেবে?

দুই পথেই পথিক আছে। তাই একেবারে নৈরাশ্যের কিছু নেই।

কিন্তু সেই সঙ্গে সাম্প্রতিক সমস্যাগুলো উপেক্ষা না করে তা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করা যেতে পারে।

গত কয়েক বছরে, দেখা যাচ্ছে মানুষের লোভ যেন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অল্পে আর সে সন্তুষ্ট নয়। বেশী চাই—সবটা চাই, না হলে ক্ষুধা মিটবে না। এবং এই রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাতে গিয়েই অনেক ব্যবসায়ী সততা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছেন। স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এমন সব জিনিস তাঁরা খাদ্যের সঙ্গে মেশাতে সুরু করেছেন। সমষ্টি চুলোয় যাক, নীয় অর্থগৃধ্নুতা তৃপ্ত হলেই হল—এমন মনোভাবের প্রেরণা থেকেই খাদ্যে ভেজাল দেওয়া চলছে। অত্যন্ত দুঃখের কথা, এক্ষেত্রেও সরকার উদাসীন। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সরকারের টনক নড়েছে। এক সংবাদে প্রকাশ, মেসার্স রেকিট এণ্ড কোলম্যান অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ডিরেক্টর ও ম্যানেজার মিঃ এ টি বলকে বালিতে ভেজাল দেওয়ার জন্যে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। দণ্ড এমন কিছু নয়; বিশেষ, যাদের অর্থ আছে তাদের কাছে তো ছেলেখেলা মাত্র। তবু দুর্নামের ভয়েও যদি অসাধু ব্যবসায়ীরা ক্ষান্ত হয়। কিন্তু অর্থলিপ্সুর কাছে সুনামের কোন মূল্য আছে কি?

হীরেন বসু

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ মাডিস্ প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত।

দেশবিদেশের খবরের জন্য

(১) **উইক্‌লী ওয়েষ্ট বেঙ্গল**—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬ টাকা, যাণ্মাসিক ৩ টাকা।

(২) **কথাবার্তা**—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থ-নীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩ টাকা; যাণ্মাসিক ১॥ টাকা।

(৩) **বসুন্ধরা**—গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২ টাকা।

(৪) **স্বাস্থ্যশ্রী**—স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি বিজ্ঞান ও খেলাধূলা সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা; যাণ্মাসিক ১॥ টাকা।

(৫) **পশ্চিম বংগাল**—নেপালী ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ১॥ টাকা।

(৬) **মগরেবী বংগাল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা; যাণ্মাসিক ১॥ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয়;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেণ্ট চাই;
(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক রাইটার্স বিল্‌ডিংস্, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে
বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী
মোহিনী মিলস্
লিমিটেড্
(স্থাপিত—১৯০৮)
১ নং মিল
কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)
২ নং মিল
বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)
ম্যানেজিং এজেণ্টস্ :
চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভ্রম সংশোধন

'সমকালীনে'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত দি ভিক্টর অয়েল কোম্পানী লিমিটেডের বিজ্ঞাপনে একটি পংক্তিতে কিছু ভুল ছিল। অংশটি সংশোধিত হয়ে নিম্নরূপ হবে :

"ভারতীয় মূলধন ও পরিচালনায় একমাত্র প্রতিষ্ঠান, পাহাড়পুর, গার্ডেনরীচে যাঁদের পর্য্যাপ্ত তৈল সঞ্চিত রাখার নিজস্ব তৈলাধার আছে।"

Vigil
AN INDEPENDENT WEEKLY
A trustworthy, outspoken Guide to India's current problems
Edited by :
Monoranjan Guha
PUBLISHED EVERY SATURDAY
Price : Four Annas
54, Ganesh Chandra Avenue,
Calcutta
Delhi Office
30, Prithviraj Road, New Delhi.
VIGIL tells the truth without fear and without malice and without indulging in cheap sensationalism. VIGIL is subservient to no interest save the interest of the nation and welfare of its people.

সমকালীন

নিয়মাবলী

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিতব্য। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা, সডাক যাণ্মাসিক তিন টাকা চার আনা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীন'এ প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। ডাকটিকিট দেওয়া থাকলে অমনোনীত গল্প ও প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠানো হয়, কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়।

'সমকালীনের' গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও ছোটগল্প, কবিতা ও উপন্যাসের বিস্তারিত ও নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুইখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

ম্যানেজার—**'সমকালীন'** ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য